তাগুতের শাসন থেকে মুক্তির ঘোষণা

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী রহ.

তাগুতের শাসন থেকে মুক্তির ঘোষণা

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী রহ.

সূচিপত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٥٦﴾ اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٥٧﴾

"দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হিদায়েতের পথ গোমরাহী থেকে পৃথকরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশংকা নেই। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূত, যে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা সকলে অগ্নিবাসী। তারা সর্বদা তাতেই থাকবে।"

(সূরা বাকারাহ: ২৫৬-২৫৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন:

اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿النساء: ٧٦﴾

"যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং (হে মুসলিমগণ) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর। (স্মরণ রেখ) শয়তানের কৌশল অত্যন্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা: ৭৬)

****

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله و كفي والصلاة والسلام على رسول الله. امّا بعد

হামদ ও সালাতের পর-

তাগূত কী?

ইমাম মালেক[1] রহ. এবং ইমাম বাগভী[2] রহ. বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সকলকেই তাগূত বলা হয়।"

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. সূরা বাকারার এই আয়াত- (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ) "এরপর যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে" এর অধীনে 'তাগূত' এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "হযরত ওমর রাযি. শয়তানকে তাগূত এর অর্থে নেওয়াকে অধিক সঙ্গত মনে করতেন। কেননা, এটা প্রত্যেক এমন মন্দ কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা জাহেলি যুগে ছিল। অর্থাৎ মূর্তির উপাসনা করা এবং মূর্তির আইনের মাধ্যমে ফয়সালা করার জন্য যাওয়া।"[3]

হযরত মাওলানা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. বলেন, "তাগূত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য অথবা ঐ উপাস্য; যে আল্লাহর ইবাদতে প্রতিবন্ধক হয়, চাই জ্বীন শয়তান হোক অথবা মানুষ শয়তান।"[4]

হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রহ. নিজের একটি ফাতওয়া; যার শিরোনাম "শরীয়াহ বিরোধী আদেশকারী শাসকগোষ্ঠী তাগূত, তাদেরকে 'উলূল আমর'এর অন্তর্ভুক্তকারীদের ইমামত জায়েজ নেই" এর মধ্যে বলেন, "ইংরেজদের কানুনের অধীনে শরীয়াহ পরিপন্থী বিচারকারীরা চাই অমুসলিম হোক, অথবা নামকা-ওয়াস্তে মুসলিম হোক, তারা তাগূত।"[5]

উপরে উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা 'তাগূত' এর বাস্তবতা ও তার অর্থ বুঝার জন্য যথেষ্ট। যা পূর্বের এক যুগের মনীষীদের সাথে সাথে নিয়মতান্ত্রিক একটি 'কানুন'-এর প্রকৃতি এবং অবস্থা দাঁড় করানো হয়েছে। এক আল্লাহ; যার কোন শরিক নেই, তাঁর সাথে বিদ্রোহ এবং লা-শরিক আল্লাহর বিরোধিতা করা। এই তাগূতী কানুনের প্রতি বিদ্রোহ; এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়, যা হযরত মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী আযমী রহ. আলোচনা করেছেন।

এই বইয়ে প্রথমত: তাগূতের অবস্থান উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, এই তাগূত মূলত: জাহিলিয়্যাত (অজ্ঞতা)। অতঃপর এই জাহিলিয়্যাতের সাথে দ্বীন ইসলামের আচার-আচরণ আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলাম এই জাহিলিয়্যাতকে পছন্দ করে, নাকি করে না? তারপর যেখানে যেখানে 'জাহেলি শাসনব্যবস্থা' প্রচলিত রয়েছে, অর্থাৎ, এমন শাসনব্যবস্থা যেখানে আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন প্রচলিত,[6] সেখানকার শাসিত মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[1] তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী ওসমানী রহ.।

[2] তাফসীরে বাগভী।

[3] তাফসীরে ইবনে কাসীর।

[4] তাফসীরে মাজহারী।

[5] কিফায়াতুল মুফতী, প্রথম খণ্ড।

[6] এই বিশেষ অজ্ঞতার সংজ্ঞা দ্বারা বর্তমান সরকার উদ্দেশ্য নয়, চাই এই অজ্ঞতা গণতান্ত্রিক সেক্যুলার (ধর্মহীন) পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা হোক, কর্তৃত্ববাদী সমাজতন্ত্র অথবা এ সময়ে কিছু স্থানে 'ইসলামী' গণতান্ত্রিক শাসন.... ঐ ইসলামী গণতন্ত্র, যাতে মানুষই বলে থাকে, আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার আল্লাহর জন্যই মনে করি, কিন্তু আইন প্রণয়ন থেকে নিয়ে আদালতগুলোর ফয়সালাসমূহে পর্যন্ত হাজার হাজার গাইরুল্লাহর ক্ষমতার প্রদর্শনকে জায়েজ মনে করে!)

তাদের বাধ্যবাধকতা এবং অক্ষমতা বিবেচনা করে শরীয়াহ কী পরিমাণ এই তাগূতী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার অনুমতি দেয়? এবং এ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার স্তর কী? কানুন রচনা করা এবং আইন প্রণয়ন করার অবস্থান কী? তাগূতী শাসনব্যবস্থার বিশেষ কর্মজীবী, যাদের দ্বারা শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হয়, তাদের অবস্থান কী? এবং এ শাসনব্যবস্থায় সাধারণ কর্মজীবীদের অবস্থান কেমন? কার জন্য এ শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে শরয়ী অনুমোদন রয়েছে এবং তার বাস্তব নমুনা কী?

তাছাড়া আজকাল আরেকটি সূরত রয়েছে, তা হলো: জাতীয় স্বার্থ। اهون البليتين অর্থাৎ দু'টি সমস্যার মধ্যে কম সমস্যার বিষয়টিকে বেছে নেওয়া। সুতরাং তাৎক্ষনিক এই 'ঢাল'-কে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিদ্যমান তাগূতী শাসনব্যবস্থার মাঝে থেকে 'সায়্যিদুনা হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম'-এর আদর্শ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, যে তিনি (নিজ যুগের) মিশরের ফিরআউনের অধীনস্থ ছিলেন। সুতরাং আমাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল যে, আমরা বর্তমান শাসনব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করব। তাছাড়া দ্বীনের নেতৃত্ব-স্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ দায়িত্ব কী? এই বইয়ে এ সবগুলোর উপর উত্তম পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এ সকল বিষয়াবলী, যার মূল মেরুদণ্ড হলো: তাগূতী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অথবা কিছু স্থানে 'আমাদের' নিজেদের-ই ইচ্ছায় আজ তা আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে! আমাদের দেশগুলোতে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে হয়তো 'ইসলামী' করণ করা হয়েছে অথবা এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা এ বিষয়টির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না যে, এই শাসনব্যবস্থার অবস্থান কী? অথচ এই আল্লাহদ্রোহী, অস্বীকারকারী, শয়তান এবং শয়তানের ইবাদতকারীদের বানানো এবং শয়তানের পূজারী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া এবং বিদ্রোহ করা আবশ্যক।

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী আযমী রহ. এই বিষয়টি "তাগূতী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তির ঘোষণা" ১৯৫১ সালে লিখেছিলেন এবং এ বিষয়টি মাসিক 'যিন্দিগী' (রামপুর, হিন্দুস্থান) এর ১৯৫১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়েছিল।

এই বিষয়টিকেই দ্বিতীয়বার কম্পোজ করে নতুন বিন্যাস এবং উর্দু ভাষার বর্তমানে প্রচলিত লেখনীর সাথে "নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ[7]" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আর এখন তা একত্রিতভাবে "নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ" এর নামে পাঠকদের সমীপে পেশ করা হল।

এই বইটিতে যেখানে যেখানে টীকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেগুলো মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী রহ.-এর লেখা। কিছু স্থানে "মাসিক যিন্দিগীর প্রকাশক" এর টীকাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সাথে সাথে 'প্রকাশক' এর দস্তখত রয়েছে। দু' চার জায়গাতে আমরাও কিছু টীকা সংযুক্ত করেছি, তবে এর সাথে "নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দের সম্পাদক' এর স্বাক্ষর বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ পাকের কাছে দু'আ করি- তিনি যেন এ চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে উম্মতে মুসলিমার জন্য, বিশেষ করে এই উপমহাদেশের মানুষদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল তাগূতের সামনে সত্য কথা বলা এবং তা থেকে মুক্তি ও বিদ্রোহকারী বানিয়ে দেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

و صلي الله علي النبي، و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

সম্পাদক

"নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ"

রজব, ১৪৪১ হিজরী / মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

---

[7] "নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ" ম্যাগাজিনটি বর্তমানে "নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ" নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাতের মাঝে সৃষ্টিগত বৈপরীত্য

প্রত্যেক জিনিস তার বিপরীত জিনিসের শত্রু হয়ে থাকে। তার বিদ্যমান থাকা প্রমাণ করে তার বিপরীত জিনিস অনুপস্থিত থাকবে। আলো সেখানে পাওয়া যাবে না; যেখানে অন্ধকার থাকবে, আর আলোকে পাওয়ার জন্য আবশ্যক হল, সেখান থেকে অন্ধকার দূরীভূত হওয়া। এটা জ্ঞান এবং যুক্তির কথা, যা কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বুঝে আসে।

ইসলাম একটি বাস্তববাদী ধর্ম এবং তারও একটি শত্রু রয়েছে, যাকে তার ভাষায় জাহিলিয়্যাত, তাগূত এবং ভ্রান্ত ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকে। যখন প্রত্যেক জিনিস তার বিপরীত জিনিসের শত্রু হয়ে থাকে, তখন আঁকল বলে ইসলামও তার বিপরীত জিনিসকে ভালবাসবে না। যদি দুনিয়াতে এমন একটি জিনিসও না থাকে, যা তার বিপরীত জিনিসের সাথে একত্রিত হতে পারে, তার সাথে মিলতে পারে এবং বিপরীত জিনিসের উপস্থিতিতে স্বয়ং তা বিদ্যমান থাকতে পারে, তাহলে ইসলামের ব্যাপারেও এই মূলনীতি অটুট থাকবে। সুতরাং যেখানে ইসলাম থাকবে, সেখানে অবশ্যই জাহিলিয়্যাত থাকবে না, আর যেখানে জাহিলিয়্যাত থাকবে, সেখানে অবশ্যই ইসলাম থাকবে না। বাধ্যকরণের কথা ভিন্ন, অপারগদের আলোচনাও এখন-ই উত্থাপিত হবে না। নিজ দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও এখন আলোচনার বাহিরে রাখা যাক। এখন শুধু এতটুকু বলতে হয় যে, মৌলিকভাবে ইসলাম সেখানেই থাকবে; যেখানে কুফর, শিরক, ধর্মদ্রোহী, তাগূতের উপাসনা, জাহিলিয়্যাতের কার্যক্রম এবং অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থাকবে না। উভয়টিকে এক সাথে পাওয়া সুস্পষ্ট ভুল এবং অসম্ভব ব্যাপার। বৈপরীত্য-ই এটার প্রকৃত সত্তা এবং সংঘর্ষ হওয়া-ই এই সত্তার প্রকৃত চাহিদা।

বৈপরীত্যের সীমানাসমূহ

বৈপরীত্য এবং সংঘর্ষের কি কোন সীমা রয়েছে? নির্দিষ্ট কিছু সীমানা আছে কি, যে শুধু তাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধ হয় এবং নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, অথবা বাহিরের জগতে একে অপরের অস্তিত্ব অথবা অস্তিত্বহীন থেকে কোন সহযোগিতা হয় না? আমাদের জীবনের এমন কিছু দিক কি রয়েছে, যেখানে এ দুই বিপরীত জিনিস, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নিজ নিজ অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে এবং অবশিষ্ট জীবন এই অবিরাম যুদ্ধ থেকে নিরাপদ থাকে? সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমাদের এই প্রশ্নের পরিপূর্ণ স্পষ্ট উত্তর জানতে হবে। কেননা, বিশাল একটি অংশ এই উত্তরের ফলাফলের উপর নির্ভর। যদি এর উত্তর হ্যাঁ সূচক হয়, তাহলে সিদ্ধান্তের ধরণ একেবারে ভিন্ন হবে। অর্থাৎ, আমাদেরকে কোন দলীল ছাড়াই এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক হবে যে, ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাত একে অপরের অনুকূলে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনের কিছু বিশেষ অংশ যদি ধারাবাহিক এবং অনুপোযুক্ত পুনঃমিলন পরস্পর সংঘাতের ময়দান হয়, তাহলে কী হবে? কিছু ক্ষেত্র এমনও আছে যেখানে কোন লড়াই নেই, একে অপরের সাথে না কোন বিরোধ আছে, আর না তার সত্তার সাথে কোন কলহ আছে। কিন্তু যদি উত্তর না সূচক হয়, তাহলে অবস্থা পরিপূর্ণ উল্টে যাবে এবং উভয়ের সংঘর্ষ স্থানীয় এবং সীমিত থাকবে না। বরং ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে এবং সীমানা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

এই হ্যাঁ অথবা না এর সিদ্ধান্ত শুধু একটি বিষয়ের উপর, বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভরশীল। আর তা হল, স্বয়ং ইসলাম কী? এবং তার বিধি-বিধান ও আমল কী? মানুষের জীবনের কতটুকু অংশজুড়ে তা সম্পৃক্ত এবং আলোচনা করে? যদি বিষয়টি এমন হয় যে, ইসলাম আমাদের যিন্দিগীর শুধু কিছু দিকের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং আমাদের কিছু আকীদা-বিশ্বাস এবং ধর্মীয় প্রথা-প্রচলনের এর মাধ্যম হয়, তাহলে উপরে উল্লেখিত আলোচনা নিঃসন্দেহে হ্যাঁ সূচক হবে এবং আমাদের মানতে হবে ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাতের মাঝে সহযোগিতা অথবা সংঘর্ষ না হওয়ার একটি বড় ময়দান বিদ্যমান থাকবে।

কিন্তু যদি বাস্তবে এমন হয় যে, ইসলাম আমাদের যিন্দিগীর পরিপূর্ণ পথপদর্শক এবং আমাদেরকে একটি সামগ্রিক জীবন-বিধান দিয়ে তার পরিপূর্ণ আনুগত্যের আহ্বান করে, তাহলে সিদ্ধান্তও না সূচক হবে। তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাতের প্রতিকূলতার দ্বন্দ্ব কখনো শেষ হবার নয় এবং তা কোন নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধও নয়।

এখন কথা হলো, ইসলামের বিধি-বিধান এবং আমল কী? কেউ যদি ইসলামের মূল উৎস কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে লক্ষ্য করে, তাহলে সে এটা মানতে বাধ্য হবে যে, ইসলাম শুধু কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও

ইবাদতের নাম নয়, বরং ইসলামের প্রশস্ততা মানুষের পুরো জীবন জুড়ে, বরঞ্চ পুরো বিশ্বব্যাপী তার ব্যাপ্তি ছড়ানো আছে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান এবং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা; যা মানুষের জীবনের সব দিককে, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে, প্রথা ও ইবাদতকে, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক লেনদেনকে; মোটকথা, সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর নিকট একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক নীতি এবং রাষ্ট্রনীতি রয়েছে। ইসলাম দুনিয়াতে এজন্যই এসেছে, যেন মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ নকশা এই নীতিমালা ও খসড়ার উপর উঠে যায় এবং মানুষ শুধু ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদতই করবে না বরং ইসলামের দেওয়া সংবিধান অনুযায়ী নিজের পুরো যিন্দেগী পরিচালনা করবে।

পারিবারিক আচার-আচরণ ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী হবে। অর্থনৈতিক লেনদেনও তার দেওয়া সীমানার ভিতরেই হবে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক নিয়মাবলী তাই হবে, যা শরীয়ার আইনে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের পথনির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মামলা-মোকদ্দমার ফায়সালা ইসলামী কানুন অনুযায়ী করা হবে, যা তার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে আলাদা হয়ে যাও, যেখানে ইসলাম আলাদা হতে বলেছে। আর সেখানে সম্পৃক্ত হয়ে যাও, যেখানে তার চাহিদা হলো সম্পৃক্ত হওয়ার। 'ইসলাম নিজের পরিচিতি এমনভাবেই প্রদান করে' কথাটি সত্য হওয়া; না হওয়া ভিন্ন বিষয়। কিন্তু তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এটি বাস্তবিকভাবেই মানুষের পুরো জীবনের উপর অন্যকে অংশীদার করা ব্যতীত আনুগত্য পোষণ করাতে চায়। ইসলামের এই পরিপূর্ণতার চরমপন্থা হয়তো কোন গণতন্ত্র প্রেমিক দলীল বানাতে চাইলে বানাতে পারে। কিন্তু সে এটা বলতে পারবে না যে, ইসলামের বাস্তবতার এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। ইসলাম হক্ব হওয়ার উপর যেমন আমাদের বিশ্বাস রয়েছে, তেমনিভাবে তার পরিপূর্ণতার উপরও স্বীকারোক্তি রয়েছে। আমরা মনে করি প্রত্যেকটি মুসলমান এই স্বীকারোক্তিতে আমাদের সাথে সমানভাবে অংশীদার। তাই বিশেষ করে শুধু এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নয় বরং আকীদা-বিশ্বাসের উপর কোন প্রমাণ পেশ করা ছাড়াই আমরা সামনে অগ্রসর হব। কেননা, আমাদের ধারণা মতে নূন্যতম প্রত্যেক মুসলমানের নিকট এটি একটি স্বীকৃত বাস্তবতা, যার উপর প্রমাণ পেশ করা সূর্যের সামনে চেরাগ দেখানোর নামান্তর। তারপরও যদি কিছু লোক এর বিপরীত ধারণা রাখে, তাহলে আমরা তাদের পক্ষে ওজর পেশ করছি যে, এ সমস্ত লোক মোটেও আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের আলোচনায় শুধু ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য, যারা অন্তত এ বিষয়ে আমাদের সাথে একমত রয়েছেন।

যখন এটা জানা গেল যে, ইসলাম আমাদের পুরো জীবনের উপর ব্যাপ্ত রয়েছে। সুতরাং তার উদ্দেশ্য হল এই যে, ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাতের সৃষ্টিগত বিরোধ সর্বদিক থেকেই কার্যকর হবে। এমন কোন দিক নেই যেখানে সংঘর্ষ এবং ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব হবে না, যেখানে এই বিরোধ এবং সংঘর্ষের আবশ্যকীয় ফলাফল দৃষ্টিগোচর হবে না এবং যেখানে অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ এই না হবে যে, বাস্তবতার দিক দিয়ে অন্যটি অস্তিত্বহীন।

মোটকথা, ইসলাম জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে নিজের অধীনে রাখতে চায়। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে তার পথে না চলা এই কথার প্রমাণ যে, সে কুফরী এবং অজ্ঞতার সীমানা সুরক্ষাদানকারী[৪]। আর এ রকম হওয়া ইসলামের জন্য স্বভাবগতভাবে অসহ্যকর। সব সময়ের জন্যই তা অসহ্যকর, চাই তা তাদের কাপুরুষতা ও বার্ধক্য এবং অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে নিজেদের অনুভূতি শক্তিকে হারিয়ে ফেলুক এবং আস্তে আস্তে এ অজ্ঞতার অবস্থাকে সাধারণ এবং গ্রহণযোগ্য মনে করুক না কেন!

জাহিলিয়্যাতের সাথে ইসলামের কৌশল

এই কারণেই ইসলামের প্রথম ইটও রাখা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহিলিয়্যাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ না পায়। ইসলামের ভিত্তি হলো তাওহীদের উপর। এই তাওহীদের বিশ্বাস যে সমস্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর শব্দসমূহ। যদি এই শব্দগুলো নিরীক্ষণ করা হয় এবং এগুলোর অর্থের উপর ফিকির করা হয়, তাহলে এ অর্থ হবে না যে, আল্লাহ এক (আল্লাহু আহাদ) বরং অর্থ এরূপ হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, কুরআনে হাকীম ইসলামের ভিত্তি রাখার পূর্বে জাহিলিয়্যাতের মূলোৎপাটন করা জরুরি মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার

[৪] হিফাযতকারী (সম্পাদক, নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ)

ইবাদতের উপযুক্ততা প্রমাণের উপর সকল গাইরুল্লাহর অস্বীকারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এ কথাটিই এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ﴿البقرة: ٢٥٦﴾

"যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা বাকারাহ: ২৫৬)

তাওহীদের মূলতত্ত্ব-এর এই কুরআনী ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যায় যে, ইসলাম ও ঈমানের ভিত্তির মাঝে তাগূতকে অস্বীকার করা অর্থাৎ জাহিলিয়্যাত থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব কতখানি। যদি কোন না-বোধক মূলতত্ত্ব কোন হ্যাঁ-বোধক জিনিসের ভিত্তি হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া এ কথা বলা যায় যে, ইসলামের প্রথম ইট জাহিলিয়্যাত এবং তাগূত অস্বীকার করাই। কেননা, কুরআনে আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথাও তাগূত অস্বীকারের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা ঐ সর্বজন স্বীকৃত কানুন অনুযায়ী, যার উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়ে এসেছি, অর্থাৎ কোন জিনিসের অস্তিত্বের জন্য তার বিপরীত জিনিস না থাকা জরুরি। এজন্য আল্লাহর প্রতি ঈমানের অস্তিত্ব এ বিষয়কে আবশ্যক করে যে, 'জেহেন' তাগূতের প্রতি বিশ্বাসের নাপাকি থেকে সাবধান হয়ে গেছে।

এ তো গেল ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের পরিপূর্ণ সত্তাগত বৈপরীত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এর উপর ভিত্তি করেই তার বিস্তারিত অনুমান করে নিন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা যে, যেই দু'টি জিনিসের মাঝে ভিত্তিগত পার্থক্য এবং স্বভাবগত বিরোধ রয়েছে; তাদের আবশ্যকীয় বিষয়, ব্যাখ্যা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীর মাঝেও সামঞ্জস্যতা হতে পারে না। মৌলিক বিরোধ যত গভীর এবং শক্ত হবে, শাখা-প্রশাখায় সামঞ্জস্যতা ততোই অসম্ভব হবে। ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাতের মাঝে যে বিশাল স্বভাবগত বৈপরীত্য রয়েছে, তা আপনার সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কীভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, ইসলাম এবং জাহিলিয়্যাতের বিভিন্ন পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতিকে, তার অগণিত জরুরি বিষয়ের মাঝে একটি জরুরি বিষয়কে নিজ খেয়াল অনুযায়ী জীবিত রাখার অনুমতি দিবে? সুতরাং ইসলাম শুধু এতটুকুই বলেনি যে, তার নিকট যেও না বরং এটাও বলেছিল যে, তাদের সহযোগিতাও করবে না। অন্যথায় এটা ঈমানী কপালে একটি লজ্জার চিহ্ন হবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾

"তোমরা গুনাহ এবং সীমালঙ্ঘনে একে অপরের সহায়তা করো না।" (সূরা মায়িদাহ: ২)

গুনাহ, জুলুম এবং বাড়াবাড়ির কাজ আর জাহিলিয়্যাতের কাজ উভয়টিই একি মূলতত্ত্বের দু'টি শাখা বা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

ইমাম বুখারী রহ. এর ভাষ্যমতে, "গোনাহসমূহ জাহিলিয়্যাতের কাজ।"[9] এজন্য যদি এ আয়াতের উদ্দেশ্য এভাবে বলা হয়, তাহলে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না যে, "জাহিলিয়্যাতের কাজের কোনটিতে সহযোগিতা করো না।"

এই কৌশলের দু'টি বাস্তব উদাহরণ

গুনাহ এবং বাড়াবাড়ির কাজে অথবা জাহেলি কাজে সহায়তা না করার অর্থ কী? তার কার্যত ব্যাখ্যা কী? তা উদাহরণের মাধ্যমে এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদসমূহের আলোকে দেখুন-

সুদ খাওয়া, যা একটি গুনাহের কাজ এবং জাহিলিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য, এ বিষয়ে হযরত জাবের রাযি. বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ[10].

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের বিষয় লিখে অথবা সুদের লেনদেনে সাক্ষী থাকে। তিনি আরো বলেন এ গুনাহের মধ্যে এরা সবাই অন্তর্ভুক্ত।"

---

[9] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

[10] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাআহ, সুদ সংক্রান্ত অধ্যায়।

আরেকটি গুনাহ, মদ পানকারীর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة إليه[11]

“আল্লাহ তা’আলা লানত বর্ষণ করেন মদ পানকারী, পরিবেশনকারী, ক্রেতা, যে তা নিংড়ায়, নিংড়াতে যে আদেশ করে, যে তা বহন করে এবং ঐ ব্যক্তির উপর যার এখানে নিয়ে রাখা হয়।”

এ সমস্ত শব্দগুলো দ্বারা অনুমান করুন যে, গুনাহ তো গুনাহ, গুনাহের সাহায্য করাও কত বড় ধ্বংসাত্মক কাজ। আর সাহায্যও কেমন সাহায্য? এতটুকুই যে, কোন মদ পানকারীকে মদের পেয়ালা এগিয়ে দিল অথবা বাজার থেকে ক্রয় করে এনে দিল বা নিংড়ে দিল, কোন সুদের কারবার লিখল অথবা তার উপর সাক্ষ্যের দস্তখত দিল বা আঙ্গুলের ছাপ দিল। আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। এটা কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবেগী ঘোষণা ছিল যে, তিনি মদ পানকারী এবং সুদখোরের ব্যাপারে এমন কঠিন ও শক্ত কথা বলেছেন? এমন কোন কু-ধারণা কস্মিনকালেও কোন মুসলমান কল্পনাও করতে পারে না। নিঃসন্দেহে তিনি এ বাক্যগুলো দ্বারা দ্বীনের ঐ সমস্ত নীতিমালার মূলতত্ত্ব থেকে পর্দা উন্মোচন করেছেন, যা উপরে উল্লেখিত আয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে বুঝা যায়। বাস্তবতা হল, এ দু’টি হাদীস এবং এ আয়াত- (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না” এর দৃষ্টান্ত। আর এগুলোর উপর অন্যান্য পাপের কাজকে কিয়াস/অনুমান করা চাই।

এ ধারণা যেন না হয়, যেহেতু এ দু’টি ছাড়া অন্যান্য অপরাধকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে উল্লেখ করেননি, তাই এ আশ্চর্যজনক ধমকি শুধু এ দু’টির সাথেই সম্পৃক্ত। কেননা, এ ধারণা ঐ সময়ই করা যেত, যখন এটা মেনে নেওয়া হবে যে, শরীয়তের বিধি-বিধান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথপদর্শনের মাঝে কোন ভাল-মন্দ অথবা উপকার ও ক্ষতির ভিত্তিমূলক হেকমত কাজ না করত এবং নিজ ভিত্তিমূলে কোন রহস্য এবং কারণ না রাখতেন। কিন্তু কোন মুসলমান এমন রয়েছে, যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের ব্যাপারে এই বেয়াদবি এবং গোস্তাখির ভার নিতে পারবে? সুতরাং এটা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে যে, এই কঠোরতা এবং ধমকি শুধু এই দুই বিষয়ের সাথেই খাস নয় এবং এটা নির্দিষ্ট কোন নিয়মের অধীনেও নয়, এমনিভাবে কোন বিশেষ কারণের উপর ভিত্তি করেও নয়। বরং আসল ঘটনা হলো: এভাবে যে বলা হয়েছে তা-(وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না” এর নীতির অধীনে বলা হয়েছে।

আর সুদী লেনদেনের কাগজপত্র লেখা ও সাক্ষী দেওয়ার মত কাজ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা একেবারেই নিরপরাধ বিষয়কে যদি লানতের উপযুক্ত বানানো হয়, তাহলে এজন্য যদিও তা সত্তাগতভাবে কোন পাপ নয়। কিন্তু তাতে সম্পৃক্ত হওয়া পাপে সহযোগিতা করা হয়। আর যখন বাস্তব বিষয় এটাই, তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যেখানেই এই কারণ পাওয়া যাবে এবং এই সহযোগিতার নীতি প্রযোজ্য বলে মনে হবে, সেখানেই অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এই হুকুম আরোপ করা হবে, যে হুকুম সুদ ও মদের ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে।

এটা কোন অস্পষ্ট বিষয় নয় বরং অত্যন্ত স্পষ্ট কিয়াস হবে। তবে হ্যাঁ! সব গোনাহ এক স্তরের না। এমনিভাবে তাতে সহযোগিতার গোনাহও এক স্তরের না। এমনকি একটি গুনাহের সহযোগিতার যে একাধিক সূরত হবে, সেগুলোর অবস্থানও এক স্তরের হবে না। মদ পানকারীর অংশে যে লানত আসবে, তা পরিবেশনকারীর অংশে আসতে পারে না। সুদখোর যে পরিমাণ আল্লাহর গজবের উপযুক্ত হবে, সাক্ষ্যদানকারী সে শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে যে গুনাহ মদ পানকারীর এবং সুদখোরের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এর থেকে তুলনামূলক হালকা গুনাহের শাস্তিও এর বরাবর হবে না। আর না তাতে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্যে সহযোগিতার এমন স্তরের অভিসম্পাতের কাজ হবে, যে স্তরের অভিসম্পাতের কাজ তার সম্পৃক্ততার সহযোগিতা হবে। কিন্তু তারপরও সকল সূরতে এ কথা আপন স্থানে অনস্বীকার্য যে, গুনাহ যাই হোক; তা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সামান্য থেকে সামান্যতর সহযোগিতাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ, জুলুম, জাহেলি কাজ এবং ইসলাম পরিপন্থী অপরাধ।

---

[11] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ।

আলোচ্য উদাহরণগুলো নির্বাচনের কারণ

কিন্তু তারপরও এ প্রশ্ন স্ব-স্থানে চিন্তার প্রয়োজন যে, সেটা কোন বিশেষ বিষয় ছিল যার ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহের সহযোগিতার বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য উদাহরণ হিসাবে এই দু'টি গুনাহের কাজকে নির্বাচন করেছেন? মূলত বিষয় হল, এই দু'টি এমন অপরাধ, যা আরববাসীদের ঝুলিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং বংশ পরম্পরায় এর ধারাবাহিকতা চলে আসছিল। তাদের জীবনাদর্শ এবং সংস্কৃতির মাঝে এগুলো মেরুদণ্ডের হাড়ে পরিণত হয়েছিল এবং তার পরিমাণ এ পর্যন্ত পৌঁছে ছিল যে, তার মাধ্যমে অন্যায় ও অপরাধ হওয়ার ধারণাও মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুদের ব্যাপারে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি কুরআনুল কারীমে আজও বিদ্যমান রয়েছে-

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

"ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই ন্যায়।" (সূরা বাকারা: ২৭৫)

বাকি রইল মদের বিষয়টি। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবেন না, কারণ তা সমস্ত মন্দ কাজের মূল হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিতে অসংখ্য চারিত্রিক এবং স্বভাবগত সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল। সুদ তো বৈধতার সীমানার কল্যাণের ভিতরে ছিল এবং তাতে শুধু বাধ্যতামূলক সংস্কৃতি ও জীবনের প্রয়োজনের নাম দিয়ে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই মদের পানপাত্র তো দ্বীনের পবিত্রতার উপর সীল মেরে রেখেছিল। মদ পান করা আরবদের চরিত্রে বৈধতার স্তর থেকে উত্তমের স্তরে গিয়ে পৌঁছে ছিল। বরং এর থেকেও আরো উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। অর্থাৎ মদ পান করা তাদের দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্রের উৎস ছিল; এর দ্বারা দানশীলতা, অন্তরের প্রশস্ততা এবং দারিদ্র প্রতিপালনের সুতা গাথা হত। শরীরে বাহাদুরি এবং জান উৎসর্গের চমক ভরে দিত। শুধু শক্তিশালী শরীরই নয় বরং 'শক্তিশালী চরিত্রের' মত জিনিসও ঘৃণার উপযুক্ত ছিল। ফলে যখন কুরআনুল কারীম প্রাথমিকভাবে এর অনিষ্টতার দিকে সামান্য ইঙ্গিত করে কিছু বলল, তখন শুধু জাহেলরাই নয় বরং মুসলিমরাও আশ্চর্যান্বিত হল এবং দরবারে সাহেবে রিসালাতে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই প্রশ্ন উত্থাপন করে দিল- "মদের ব্যাপারে শরীয়তের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কী?"

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿البقرة: ٢١٩﴾

"তারা আপনার নিকট মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।" (সূরা বাকারাহ: ২১৯)

তাদের প্রশ্ন করার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মদ উঁচু মাপের গুণাবলীর একটি মাধ্যম এবং খালেস দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গিতেও তা অসাধারণ উপকারী। তাই বুঝে আসছে না, তার ব্যাপারে ওহীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তিত রূপ কেন দেখা যাচ্ছে। "নিঃসন্দেহে তাতে অনেক কল্যাণ ও ফায়দার দিক রয়েছে। শুধু দুনিয়াবি এবং সত্তাগতই নয় বরং খালেস দ্বীনি এবং চারিত্রিক দিক থেকেও। কিন্তু এ সমস্ত উপকারী দিকের বিপরীতে তার মধ্যে যে মন্দ দিকগুলো রয়েছে, সেগুলো এর থেকে অনেক গুণ বেশি।" তাই এটিকে কোন উত্তম কাজ এবং ভাল অভ্যাস মনে করার সুযোগ নেই। তাকে আজ না হয় কাল ছাড়তে হবে-

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"আপনি বলে দিন, এ দু'টির মধ্যে মহাপাপও রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে। আর এ দু'টির পাপ উপকার অপেক্ষা গুরুতর।" (সূরা বাকারাহ: ২১৯)

আপনি জেনে থাকবেন যে, সমস্ত মন্দ কাজগুলো যখন ভালোর রূপ ধারণ করে এবং সমাজ তাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে তার সম্পর্কে আগ্রহ কি পরিমাণ গভীর এবং দৃঢ় হয়ে থাকে, আর তা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি পরিমাণ বিস্তৃত হয়ে থাকে। তখন এ ধরনের মন্দ কাজকে মিটানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় এবং তা অনেক সু-কৌশলের মাধ্যমে করতে হয়। সুতরাং মদ এবং সুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা শরীয়াহ প্রণীত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা হলো: পর্যায়ক্রমে তা হারাম করেছেন। পর্যায়ক্রমে করার কারণ মূলত: এটাই ছিল। যখন পুরো সমাজকে মানসিকভাবে সংশোধন করার পর এগুলোকে অকাট্য হারামের চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হল, তখন আবশ্যিকভাবে ঐ সমস্ত বাহ্যিক কল্যাণ, ক্ষতির দিকে যাওয়ার সমস্ত দরজা মজবুতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি হিকমতের শিক্ষক ছিলেন এবং আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষকও ছিলেন। তিনি এমন শব্দ উল্লেখ করেছেন; যেগুলো উপরে উল্লেখিত হয়েছে, আর এমন ধমকি শুনিয়েছেন; যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

একটি মৌলিক কথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিশেষভাবে মদ এবং সুদের ব্যাপারে এই কঠোরতার ভিত্তিতে শরয়ী কানুনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝা যায়। আর তা হলো: যদিও সত্তাগতভাবে কিছু গুনাহের ক্ষতি খুব বেশী না হয়, কিন্তু তারপরেও তাতে বহিরাগত এবং পরিস্থিতিগত কিছু কল্যাণ এমন থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে ক্ষতির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়, এমনকি তা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যায়। যদি বিশেষ কল্যাণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, মদ এবং সুদ সত্তাগতভাবে মন্দ, তথাপিও তা হত্যা এবং যিনার মত গুনাহ থেকে অনেক হালকা। কিন্তু ঐ বিশেষ কারণসমূহ এবং পরিস্থিতিগত কারণে; যার আলোচনা আমরা সবেমাত্র উপরে উল্লেখ করলাম, মদ পান করা এবং সুদ খাওয়াকে এমন স্বীকৃত গুনাহসমূহ থেকেও চূড়ান্ত পর্যায়ের নিকৃষ্ট গোনাহ বলা হয়েছে। এমনকি এক দিরহাম সুদ খাওয়াকে ছত্রিশবার যিনা করার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে[12] এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং তাওবা না করে, তাহলে তার মৃত্যুকে মূর্তিপূজকের মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[13]

এমন হলো কেন? কারণ এ জিনিসগুলোর মাধ্যমে এই ধারণাকেই ভুলিয়ে দিয়েছিল যে, এটা কোন গুনাহের কাজ এবং একটা সময় পর্যন্ত এগুলোর ব্যাপারে এই ধারণা করা হত যে, এগুলো বাধ্যতামূলক সংস্কৃতি ও জীবনের প্রয়োজন। অথচ বাস্তবতা হল, এগুলো দ্বীন দুনিয়ার কোন আলোচ্য বিষয়ের মাঝেই পড়ে না, তবে তা উত্তম চরিত্রের মাধ্যম কীভাবে হবে? যেন এই নীতি হয়ে গিয়েছিল যে, যত হালকা বিষয়ই হোক না কেন, যদি তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়, তবে তাকে বাধ্যতামূলক সংস্কৃতি ও জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন হিসাবে গ্রহনযোগ্যতা দিয়ে দেওয়া হবে। তাকে চারিত্রিক উপকারিতার উপকরণ সাব্যস্ত করে দেওয়া হবে, তাহলে তার ওজনের পরিমাণ সত্তাগত সাধারণ ওজন থেকে কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

এমনিভাবে অনেক সময় ছোট নেকির কাজও ঈমানের ভিত্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে যখন ব্যাপকভাবে কার্যত তাকে অকার্যকর মনে করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহকে আজ নতুন করে পুনর্জীবিতকারী একশত শহীদের সাওয়াব পাবে, যদি এমন শুনে থাকেন; তাহলে তা এ হিসাবেই বলা হয়ে থাকে। আর যদি কখনো মৌজার উপর মাসেহ করাকে পর্যন্ত ঈমান সংশ্লিষ্ট আলোচনায় তালিকাভুক্ত করা হয়, তাহলে এই নীতির আলোকেই করা হবে। অন্যথায় কোথায় সরাসরি হক্কের পথে প্রিয় জানকে উৎসর্গ করা, আর কোথায় একটি শাখাগত সুন্নাহের অনুসরণ! এমনিভাবে কোথায় ঈমান আর কোথায় মৌজার উপর মাসেহ!

জাহেলি শাসনব্যবস্থার অধীনে শাসিত মুসলমান

উল্লেখিত কয়েকটি মৌলিক ভূমিকা আলোচনার পর এখন আমাদের দেখতে হবে, যদি বিপদজনক কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা মুসলিম দল জাহেলি সংবিধানের অধীনস্থ হয়ে যায়, তাহলে তার কী করা উচিত? সে এই সংবিধানকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে? তার সাথে কী আচরণ করবে? সহযোগিতামূলক নাকি অ-সহযোগিতামূলক?

উত্তম হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনার পূর্বে আমরা জাহেলি শাসনব্যবস্থা অথবা অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থার ধারণা আমাদের 'জেহেনে' জাগ্রত করে নিব। আর আমরা যখন কোন মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, তখন এই বাস্তবতা আমাদের দৃষ্টির সামনে পরিপূর্ণ গুরুত্বের সাথে উপস্থিত হয় যে, কোন অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থার আইন-কানুন এবং রাজনীতির ভিত্তি সেটা হবে না, যা ইসলাম নির্ধারণ করেছে। যেমন- আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের (বিচারকের) হক স্বীকার করা হবে না, সংবিধানের উৎস কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ হবে না, দিওয়ানী এবং ফৌজদারি কানুন ইসলামের হবে না (আর যদি কিছু ইসলামী

---

[12]قال رسول الله صل الله عليه وسلم"درهم ربوا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة ثلثين زينة (مسند احمد المجلد الخامس, صفحه 225، سنن الدار القطني, كتاب البيوع,حديث نمبر 45)

[13]قال رسول الله صل الله عليه وسلم " مدمن الخمر ان مات لقي الله تعالي كعابد وثن " (مسند احمد بن حنبل, المجلد الثاني, ص 272)

হয়েও থাকে, তাহলে তার ভিত্তি কখনো ইসলাম হবে না), আইনি ও বেআইন বিষয়াদী তথা হালাল এবং হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়ত থেকে অমুখাপেক্ষী হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে, আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তাতে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারটুকুও থাকবে না। এমনকি মুসলমানদের একান্ত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়েও (পার্সোনাল বিষয়) তাদের ইসলামের উপর আমল করার যে স্বাধীনতা থাকবে, তা বাস্তবিক অর্থে এ ভিত্তিতে নয় যে, এটা তাদের 'অধিকার'। বরং এজন্য হবে যে, ঐ জাহেলি শাসনব্যবস্থা নিজ পরাজিত শত্রুকে (ইসলাম) অনুগ্রহপূর্বক এ পরিমাণ দম নেওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছে।

যে জাহেলি শাসনব্যবস্থার কদাকৃতি এমন হবে, তার চেহারা-সূরতকে যতই হৃদয় আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করা হোক না কেন, একজন মর্দে মু'মিন; মু'মিন হিসাবে তার প্রতি অনুরাগী হয়ে নিজেকে নিজে শেষ পর্যন্ত কতটুকু ধোঁকা দিবে? যে শাসনব্যবস্থায় এই সংবিধান, ব্যবস্থাপনা, বিচারালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানের চাবিকাঠি আল্লাহবিমুখ মানুষদের নিজেদের বানানো নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তাকে ইসলামের একজন সাচ্চা অনুসারী কোন দৃষ্টিতে দেখবে? যদিও স্বভাবগতভাবে এর উত্তর মনোলোভা নয়, কিন্তু এছাড়া অন্য কোন উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়।

আর এটা স্পষ্ট বিষয়, যে ইসলাম গুনাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, যার এক ঝলক জাহিলিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়ে আপনার সবেমাত্র দেখেছেন। সে ইসলাম এই আপাদমস্তক জাহিলিয়্যাতের সাথে সহযোগিতার নামও শ্রবণ করা কখন পছন্দ করবে! হ্যাঁ, যদি জীবনের এসব ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোন রীতি-নীতি না থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে ঐ অপছন্দের কোন কারণ থাকত না। কিন্তু যখন এটি একটি স্বীকৃত কথা যে, জীবনের এমন কোন দিক নেই, যেখানে ইসলামের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নেই। সুতরাং এই অপছন্দ থাকাটা সর্বদা অবস্থায় আবশ্যক।

মোটকথা, এটা সম্ভব নয় যে, কোন মু'মিন প্রশান্ত মনে জাহেলি শাসনব্যবস্থার সহযোগিতা করবে। একইসাথে সে ইসলামের প্রতিনিধি ও পতাকাবাহী হবে, আবার তার শত্রুর পক্ষের পতাকাবাহীও হবে। এটা অসম্ভব কল্পনা মাত্র, অথবা অজ্ঞাতপূর্ণ ধারণা।

'আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে- মুনকার কাজ থেকে শুধু বিরত থাকাই নয়, বরং বাধা দেওয়াও ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়।' (আত-তাওবা, রুকু: ১০) 'এবং তা মূলোৎপাটন করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা থেকে প্রশান্ত থাকা মৃত ঈমানের আলামত।' (মুসলিম) 'আর তার দিকে আহ্বান করা মুনাফিকদের প্রকৃতি।' (আত-তাওবা, রুকু: ১০)

আর এই 'মুনকার' এর সংজ্ঞা আমাদের উলামায়ে কেরাম এভাবে করেছেন যে, "প্রত্যেক এমন জিনিস মুনকার, যা শরীয়াহ প্রত্যাখ্যান করে, অথবা সুস্থ বিবেক প্রত্যাখ্যান করে।[14]"

সুতরাং শরীয়াহ এ সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবস্থাপনা এবং আদালতের নিয়ম-কানুনকে প্রত্যাখ্যান করে না, যার দিকে যেকোনো জাহিলিয়্যাতের শাসনব্যবস্থার মাঝে পরিপূর্ণরূপে আহ্বান করা হয়? যদি কারো মাথায় শুধু হত্যা, যিনা, চুরি এবং মিথ্যার মত বিষয়গুলোই মুনকার বলে মনে হয়, তাহলে তার কথা ভিন্ন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুনকার দ্বারা ঐ জিনিস উদ্দেশ্য নেয়, যা বাস্তবেই মুনকার, তাহলে সে এ সমস্ত কথাগুলোকে শুধু মুনকারই নয় বরং সুস্পষ্ট মুনকার মানতে বাধ্য হবে, আর যদি সে কোন সুদি কারবারের ব্যাপারে সাক্ষী হওয়া থেকে শত বার আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে, সে এ ধরনের মুনকারের প্রচলন ঘটানো এবং প্রতিষ্ঠা করা থেকে হাজার বার আল্লাহর আশ্রয় কামনা করবে।

সাহায্যের বিভিন্ন স্তর

কিন্তু যে ব্যক্তি বা দল এ রকম শাসনব্যবস্থায় ফেঁসে গেছে, সে তা থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারবে না। তাহলে এমতাবস্থায় তার কার্যত দায়িত্ব কী হবে এবং তার কী করা উচিত? এটা একটা কঠিন প্রশ্ন; যার উত্তর আমাদের পরিপূর্ণ গুরুত্বের সাথে খোঁজা উচিত।

---

[14] المنكر ما ينكر بها [মুনকার প্রত্যেক এমন কাজকে বলে, যা শরীয়ত অথবা আকলের কাছে অপছন্দনীয় হয়।-(মুফরাদাত, রাগেব ইসপাহানী)]

এই শাসনব্যবস্থার সাথে তার দু'ভাবে সম্পর্ক হতে পারে। প্রথমত: ইচ্ছাকৃত, দ্বিতীয়ত: অনিচ্ছাকৃত। আর এটা স্পষ্ট যে, যে সংস্কৃতি এবং কানুনের সাথে সম্পর্ক রাখতে সে একেবারেই অপারগ এবং নিজ চাহিদা ও পছন্দের বিপরীত বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অক্ষম, এ প্রেক্ষিতে তার উপর কোন অভিযোগ ও আপত্তি নেই। কিন্তু সম্পর্কের প্রথম প্রকার অবশ্যই ভাবনার বিষয়, আর আমাদের এই সম্পর্কের ব্যাপারেই পবিত্র শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি জানা প্রয়োজন।

এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের এই ঐচ্ছিক সম্পর্কের বিভিন্ন সূরত সম্পর্কে জেনে নেওয়া উচিত। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা না জানব যে, এই আপাদমস্তক জাহিলিয়্যাতের (অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থার) সাথে সহযোগিতার (ঐচ্ছিক সম্পর্ক) কী কী পদ্ধতি রয়েছে এবং এর প্রত্যেকটির অবস্থান/পর্যায় কী, ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ফলাফলে পৌঁছা আমাদের জন্য অনেক কঠিন হবে।

যতদূর বণ্টন নীতিমালার সম্পৃক্ততা রয়েছে, আমরা ঐচ্ছিক সম্পর্ক তথা সহযোগিতামূলক কাজের দু'টি বড় বড় প্রকার সাব্যস্ত করতে পারি। প্রথমটি মৌলিক, দ্বিতীয়টি শাখাগত। মৌলিক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও টিকিয়ে রাখার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণ করা। যেমন- আপনি এই শাসনব্যবস্থার নেতা বা পতাকাবাহীদেরকে বলতে পারেন। এ প্রকারে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার দু'টি ভিত্তিমূলক আলোচনায় আসতে পারে। যথা; সাংবিধানিক অংশগ্রহণ ও আইনসভায় সদস্যপদ গ্রহণ। শাখাগত প্রকারে এ শাসনব্যবস্থার সাধারণ কর্মচারীরা অন্তর্ভুক্ত, যাদের অবস্থান এ শাসনব্যবস্থার চেহারার তুলনায় অন্যান্য অঙ্গ-পতঙ্গের ন্যায়। আর মৌলিক নীতিমালার উদাহরণ প্রধান অঙ্গ ও মেরুদণ্ডের ন্যায়।

অতঃপর এই শাখাগত শ্রেণি আবার দুই প্রকার। প্রথমত: ঐ সকল কর্মচারী যাদের দায়িত্বটাই অপরাধমূলক এবং তাতে এমন কাজ করতে হয়, যা সরাসরি শরীয়ত পরিপন্থী। যেমন- মদ্যশালা বিভাগের কর্মচারীরা, সুদি প্রতিষ্ঠানগুলোর (ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি) কর্মচারীরা, জজ এবং মুনসেফদের মত কর্মকর্তাগণ এবং আল্লাহর পথ ভিন্ন অন্য কোন পথে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ(তথা তাগুতের অধিনস্ত সকল বাহিনী) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার কর্মচারী হলো: যাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ মনে হয় এবং বাহ্যিকভাবে তাদের মাঝে কোন মুনকার বাস্তবায়ন করতে দেখা যায় না। কিন্তু যেহেতু এটা একটি অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থারই অংশ এবং এতে জাহিলিয়্যাতের বিস্তৃত কাজের সহযোগিতা হয়, এজন্য এইটা গুনাহের কাজ হয়ে যায়।

আপনি তাদের ব্যাপারে এভাবে বলতে পারেন যে, এটা নিজে তো গুনাহ নয় কিন্তু প্রাসঙ্গিক কারণে অবশ্যই গুনাহ। যেমন চিঠি ও ডাক বিভাগের কর্মচারীগণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীগণ, (কিছু শর্তসাপেক্ষে) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ইত্যাদি।

এটা একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে, ঐচ্ছিক সম্পর্কের এই তিন প্রকার 'গুনাহের কাজে সহযোগিতা' করার দিকসমূহের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সবগুলোর বিধান এক হতে পারে না। যতদূর কাজ না করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন রয়েছে, সেক্ষেত্রে এই নাপাক দাগের তিলক চিহ্ন তো আমাদের সকলের কপালের উপর-ই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তাদের পদের মাঝে পার্থক্য থাকাটাও একটি স্বীকৃত বিষয়। প্রত্যেক নাপাক দাগের একই গুনাহ হতে পারে না। আমরা এখানে এই তিন প্রকারের অধীনে প্রত্যেকটা নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করব। (ইনশা আল্লাহ)

১. সংবিধান ও আইনসভায় অংশগ্রহণ

কোন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি, যার উপর তার পুরো ভবন দাঁড়ায়; এটা হলো তার আইন, অথবা ঐ সকল নীতিমালা, যেগুলো এই আইনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। এজন্য আইন-কানুন প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই আইন সেই আইন না হয়, যা কুরআন ও সুন্নায় লিখিত আছে, বরং তার চিত্র একেবারেই ভিন্ন হয় এবং ঐ সকল মৌলিক নীতিমালা ও বাধ্যবাধকতা না মানে, যেগুলো ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাহলে এর অর্থ হলো এই যে, এ সকল আইন-কানুন থেকে অসন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া; আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রাথমিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত, আর তার কাউন্সিলসমূহে বসা মানে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ভিত্তিমূলের উপর কুঠার চালানো। ইসলামী শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হলো: আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার উপর বিশ্বাস। এখন যদি এমন একটি সংবিধান তৈরি হতে থাকে, যার প্রথম ইট- "মানুষ/জনগণ সকল শক্তির উৎস অথবা অধিকাংশের ফায়সালার উপর রাখা হয়" তাহলে তার উদ্দেশ্য এটা ছাড়া আর কি হবে যে, প্রথম কদমেই আল্লাহ তা'আলার সাথে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে।

এরপরও কোন মুসলমানের জন্য এই সংবিধান সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা, আল্লাহ তা'আলার বিতর্কমুক্ত একচ্ছত্র অধিকারে বেয়াদবিমূলক অনুপ্রবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ অনুপ্রবেশ; যার দ্বারা মুলহিদদের, নাস্তিকদের এবং মুশরিকদেরই শোভা বৃদ্ধি করা হয়। আর তা সবচেয়ে বড়-(تَعَاوَن عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) 'গোনাহ এবং সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা' করা হয়। তাই ভবিষ্যতে তার যেকোন পদক্ষেপই নেওয়া হবে, তা কার্যত জাহেল দানবদের সন্তুষ্টির জন্যই নেওয়া হবে, চাই জবান তাদের বিরুদ্ধে বলার জন্য ওয়াকফকৃত হোক না কেন। অথচ মুসলমান হিসাবে সে এই শাসনব্যবস্থাকে মূলোৎপাটন করতে আদিষ্ট হয়েছে এবং এই মুনকারের উৎসের বিরুদ্ধে অবিরত চেষ্টা ও মেহনত করাও তার অবশ্য করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কেউ বলতে পারে যে, ঐ মানুষের অন্তরে কোন জাহেলি শাসনব্যবস্থার শাখা-প্রশাখার শ্রেষ্ঠত্বের চাইতে আর কি সংকোচ অনুভূত হবে, যে নিজের কলিজার রক্ত সিঞ্চন করে এ জমিনকে ভিজায়, যাতে তাতে বীজ গজাতে পারে। তারপর তাতে নিজের জান উৎসর্গ করে, যাতে এই খবিস গাছ যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ফুল-ফলে ভরপুর হয়ে এমন উপযুক্ত হয়ে যায় যে, মানুষের সারা যিন্দেগীকে নিজের অধীনে নিয়ে নিতে পারে। যুক্তির জগত হয়ত এই অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ সকল লোকদের (যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করে থাকে) কর্মপদ্ধতিকে কুফর, জুলুম এবং ফিসক বলে অবহিত করেছেন-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[15]﴿المائدة: ٤٤﴾ ...الظَّالِمُونَ ﴿المائدة: ٤٥﴾... الْفَاسِقُونَ ﴿المائدة: ٤٧﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের.... জালেম.... ফাসেক।"

(সূরা মায়েদা: ৪৪, ৪৫, ৪৭)

যখন আল্লাহর নাযিলকৃত আইন-কানুন ব্যতীত অন্য কোন আইন-কানুন দ্বারা বিচার-ফায়সালা করা জুলুম, ফিসক এবং কুফরি কাজ, তাহলে অনুমান করুন- আল্লাহর নাযিলকৃত আইন-কানুনের পরিবর্তে অন্য কোন আইন-কানুন প্রণয়নকারী ব্যক্তি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হবে? এমন লোকদেরকেই তো তাগূত বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴿النساء: ٦٠﴾

"এই মুনাফিকরা চায়, নিজেদের ফায়সালা তাগূতের দ্বারা করাবে।" (সূরা নিসা: ৬০)

সুস্পষ্ট কথা হল, এই তাগূত দ্বারা শয়তান উদ্দেশ্য নয়[16], বরং ঐ সমস্ত ইয়াহুদী নেতা [বিশেষ করে কা'ব বিন আশরাফ অথবা আবু বারজী আসলামী গণক (তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী)] যারা নিজেদের বানানো আইনের মাধ্যমে লোকদের মোকদ্দমার

---

[15] এই আয়াতের ব্যাপারে একটি আশ্চর্যজনক কথা অবতরণ করা হয়েছে। তা হলো: এই আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেন একথা বলে কোন মূল্যবান বিষয়ের পর্দা উন্মোচন করা হচ্ছে। প্রথমত: এটা সর্বসম্মত কোন কথা নয় যে, এটা ইয়াহুদীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। তারপরও যদি মেনে নেওয়া হয় যে, শানে নুযূল হিসাবে এটা ইয়াহুদীদের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, তাহলে প্রশ্ন হল, এর কী পার্থক্য সূচিত হয়? আয়াতের এ অংশে কি ওজু বা পবিত্রতার মত কোন শাখাগত মাসআলার আলোচনা করা হয়েছে, যার সম্পর্কে এটা বুঝে নেওয়া যেত যে, তা মূসা আলাইহিস সালাম এর শরীয়তের সাথেই খাস/নির্দিষ্ট ছিল। আর এখন যেহেতু ঐ শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে, তাই কুরআন ওয়ালাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই? অথবা বাস্তব বিষয়টি কি ঠিক এর বিপরীত নয়? এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার একটি পরিপূর্ণ কানুন এবং দ্বীনের সুদৃঢ় নীতিমালা আলোচিত হয়নি, যা শরীয়ত পরিবর্তনের কারণেও নিজে পরিবর্তন হয় না?
আশ্চর্যজনক বিষয় হল, এই সুস্পষ্ট বিষয়টি অনেকে বুঝতে পারে না। আর এভাবে প্রকাশ করা হয় (আল্লাহর পানাহ চাই) যে, আল্লাহ তা'আলার ইনসাফপূর্ণ নীতিমালা এবং প্রতিদানও পরিবর্তনযোগ্য। আর তা এভাবে যে, কিছু জাতির প্রতি তার প্রতিদান-শাস্তি এক রকম, আর কিছু জাতির প্রতি অন্য রকম। একই কাজ যদি ইয়াহুদীরা করে, তাহলে হত্যার উপযুক্ত হবে, আর ঐ কাজই মুসলমানরা করলে ক্ষমার যোগ্য হবে। যে সকল ব্যক্তিবর্গ উল্লেখিত আয়াতের ধমকিকে ইয়াহুদীদের 'সংরক্ষিত অধিকার' সাব্যস্ত করে নিজেরা পরিতৃপ্ত হয়ে যেতে চান, যখন এই ধারণা করেন যে, 'স্বয়ং ইউসুফ আ. নিজ জামানার ফিরআউনের রাজ্যে কাজ করেছেন', তখন তারা এটাকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে নেন, যেন কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ হুকুম এটাই। এ স্থানে কি এ কথা মনে পড়ে না যে, এই পন্থা এমন এক শরীয়তে অবলম্বন করা হয়েছে যা রহিত হয়ে গেছে?"

ফায়সালা করত। অথচ আল্লাহর আইন তাদের নিকটেই বিদ্যমান ছিল। এমনিভাবে আরেক স্থানে এমন আইন-কানুনকে শরীয়ত বিরোধী জাহেলি আইন-কানুন বলা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴿المائدة: ٥٠﴾

"তবে কি তারা জাহেলি যুগের ফয়সালা কামনা করে?" (সূরা মায়েদা: ৫০)

এখন যারা এই জাহেলি আইন-কানুনের রচয়িতা হবে তাদের অবস্থানের উপর চিন্তা করা যাক। এটা স্পষ্ট যে, এই আইন প্রণয়ন এবং কানুন তৈরি করা জাহেলি শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং এ কাজে অংশগ্রহণকারী 'গুনাহের কাজে সহযোগিতা' এর সব থেকে বড় পদ্ধতি অবলম্বনকারী বিবেচিত হবে এবং তার অবস্থা জাহেলি শাসনব্যবস্থায় অন্যান্য সাহায্যকারীদের তুলনায় পথপদর্শক, নেতা এবং সরাসরি কাজ আঞ্জাম দানকারী বলা হবে। অতঃপর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার অন্যায়ও আবশ্যকীয়ভাবে ভয়ানক হবে। ইফকের (অপবাদের) ঘটনার সাথে অনেক লোকই সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু সর্বশেষ শাস্তি এবং 'বড় আযাবের' শাস্তি শুধু ঐ সকল হতভাগাদের জন্যই এসেছে, যে এই অপবাদের রচয়িতা এবং এই বিশৃঙ্খলার লিডার ছিল।

এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿النور: ١١﴾

"তাদের প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে নিজ কৃতকর্মের গুনাহ। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর (এ অপবাদের) ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।" (সূরা আন-নূর: ১১)

শরীয়ত পরিপন্থী আইন প্রণয়নে অংশীদার এই ব্যক্তির সত্ত্বা নাপাক। যার কারণে উলামায়ে দ্বীন এটিকে নিকৃষ্ট গোনাহ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। মরহুম মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, "কিছু লোক ইংরেজ সরকারের অধীনে সম্মান ও প্রভাবের অধিকারী(অর্থাৎ ইংরেজদের আইনপ্রণয়ন পরিষদে তাদের নাম রয়েছে) এবং তারা শরীয়ত পরিপন্থী আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে। এ রকম আইন-কানুনকে গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ আছে কিনা? আর ঐ সকল লোক এ আইন-কানুন প্রণয়নের কারণে কাফের হবে কিনা?

তিনি উত্তরে বলেছেন:

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যা বলেছেন, সেটাই সঠিক। তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴿المائدة: ٤٤﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের।" (সূরা মায়েদা: ৪৪)

সুতরাং শরীয়াহ পরিপন্থী কানুন গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য হারাম এবং যে এ কানুন অনুযায়ী আমল করবে, তার গুনাহ আইন প্রণয়নকারীর উপর বর্তাবে। আর যদি এ আইন প্রণয়নকারীরা শরীয়াহ আইনকে খারাপ মনে করে এবং এই কানুন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং শরীয়াহকে যুক্তি পরিপন্থী মনে করাসহ আরো বিভিন্ন নেগেটিভ ধারণা পোষণ করে থাকে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি তারা শরীয়াহ আইনকে খারাপ মনে না করে, তাহলে যদিও কাফের হবে না, কিন্তু নিঃসন্দেহে অনেক বড় ফাসেক বলে বিবেচিত হবে।" (ফাতওয়া ২য় খণ্ড, ইউসূফী প্রকাশনা, পৃষ্ঠা: ৪৮, ৪৯)

এমনিভাবে নিকট অতীতে যখন এই হিন্দুস্থানে ব্রিটেনিয়ান/বৃটিশ তাগূতরা হুকুমত কায়েম করেছিল, তখন একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে পাঁচশ উলামামে কেরামের দস্তখত সম্বলিত এই ফাতওয়া প্রকাশ হয়েছিল যে, "কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করা

---

[16] সুতরাং তাগুতের মর্মার্থ উলামায়ে আদব এই বর্ণনা করেছেন যে,

الطاغوت عبارة عن كل معتد و كل معبود من دون الله– و لما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخيرطاغوتاً .

(তাগুত দ্বারা ঐ সত্ত্বা উদ্দেশ্য, যে নিজ সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছে এবং আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক ছোট মা'বূদও তাগুত। এই বুনিয়াদী অর্থের উপর ভিত্তি করেই; যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জাদুগর, গণক, দুষ্ট জ্বীন এবং সত্য সঠিক পথ থেকে বাধা প্রদানকারী মানুষ সকলেই তাগুত বলা হবে।) [মুফরাদাত, রাগেব ইসপাহানী]

হারাম” এবং এর যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক এবং সাময়িক কারণসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ কারণ এটাও ছিল যে:

“কাউন্সিলে অধিকাংশ শরীয়ত পরিপন্থী আইন-কানুন প্রণয়ণ করা হয়[17]। যেগুলোর পক্ষে আন্দোলন, সমর্থন, চুপ থাকা অথবা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিরোধিতা না করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،

“তোমাদের যে কেউ কোন মুনকার দেখবে সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে জবান দ্বারা, যদি তাতেও সক্ষম না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করে দিবে।”

কিন্তু কাউন্সিলের মুসলিম সদস্যগণ এ সবকিছুই করেছেন, যার সাক্ষী অতীতের ঘটনাবলী এবং বর্তমানে এই কানুনের বাস্তবায়ন।”

ফতোয়ার ইতিহাসে মনে হয় এটাই একমাত্র ফাতওয়া, যা গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়েছে এবং যার উপর পাঁচশ উলামায়ে কেরামের সত্যায়নমূলক সীল ছিল। আর বাস্তবে এটা এমন একটি মাসআলা-ই ছিল, যার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব রয়েছে। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং পশ্চিমা ছাঁচের মুসলমানদের একটি দল তাগুতী পার্লামেন্টে অংশগ্রহণে কোন সমস্যা মনে করত না। আর আপনি এইমাত্র জেনেছেন যে, একটি সাধারণ গুনাহও ঐ সময় বড় গুনাহ হয়ে যায় বরং সবচেয়ে বড় গুনাহ হয়ে যায়, যখন মানুষ সে গুনাহকে বড় গুনাহ মনে করা থেকে অপরিচিত হয়ে যায় অথবা অপরিচিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আর এখানে তো শরীয়াহর পরিপন্থী আইন-কানুন প্রণয়নের মত বিশাল বড় গোনাহ! জাহেলি শাসনব্যবস্থার সহযোগিতার আরো বিভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে। তথাপি ঐ সবগুলোর বিপরীতে এই বিশেষ প্রকারের বেশি গুরুত্ব এজন্য যে, এর সম্পর্ক মানুষের আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে, শুধু আমলের সাথে নয়। আর এ কথা সকলেই জানে যে, আকীদার বিষয়াবলী বাহ্যিক আমলের অপূর্ণতার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে।

২. জাহেলি শাসনব্যবস্থায় বিশেষ কর্মচারীবৃন্দ

জাহেলি শাসনব্যবস্থার সহযোগিতার দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতিও গোনাহ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যে কাজ স্বয়ং গুনাহ, সে কাজের একটি ভ্রান্ত শাসনব্যবস্থার চাকরি এবং সেবা প্রদান করার ‘মর্যাদা’ যদি সহজে অর্জিত হয়েও যায়, তাহলে তো তা দু’টি অগ্নির রূপ লাভ করবে এবং এ পর্যন্ত যদিও তা মুনকার হিসাবে ছিল, কিন্তু এখন তা ফাহশা তথা চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীল কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ এক গোনাহ ডাবল গোনাহে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সামান্য একটু চিন্তা করুন তো! জনৈক ব্যক্তি কোন একজন মহাজনের দোকানে বসে তার হিসাব-নিকাশ করে এবং সে যে সুদি কারবার করে; তার হিসাব-কিতাব এবং প্রমাণপত্র লিখে, তাহলেও শরীয়তে মুহাম্মদী তাকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি ঐ ব্যক্তিই জাহেলি শাসনব্যবস্থার রুকন/মেম্বার হয়ে যায় এবং ব্যাংকের কর্মচারী হয়ে সুদি লেনদেন করে। অন্যদিকে ঐ জাহেলি শাসনব্যবস্থার প্রচার এবং প্রতিষ্ঠায়ও সাহায্যকারী হয়ে যায়, তাহলেও কি সে অভিসম্পাতের সেই স্তরটাতেই থাকবে, যে স্তর মহাজনের দোকানের ক্ষেত্রে ছিল? এমন কেউ কি আছে যে, তার (অভিসম্পাতের) ‘উচ্চ স্তর’-কে অস্বীকার করতে পারবে? এই একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ প্রকারের অন্যান্য কর্মচারীদেরকে বুঝে নিন। যদি মদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে গরীব কুলিও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত হয়, তাহলে মদ্যশালা বিভাগের কর্মচারীরা কেন অধিক অভিশপ্ত হবে না, অথচ এতে অতিরিক্ত আপাদমস্তক জাহেলি শাসনব্যবস্থার গোঁড়াকে শক্তিশালী করছে?

যদি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহ আইনকে বাদ দিয়ে অন্য আইন দ্বারা বিচার-ফায়সালাকারী কুফর, ফিসক এবং জুলুমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাগূতী আদালতে বসে নিজের বিচার-ফায়সালাকারী কীভাবে ইসলামকে মুহাব্বতের দাবী করতে পারে? অথচ সে একটি আপাদমস্তক বাতিল মিশনারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশও হয়ে আছে? যদি ইসলামী বাহিনীর সাথে যুদ্ধকারী

[17]এই কারণেই শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এই রাষ্ট্রকেও দারুল হারব বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও এখানে শা‘আয়িরে ইসলাম তথা ইসলামের নিদর্শনাবলী চালু রয়েছে। কিন্তু এখানে তা বাস্তবায়নের ভিত্তি তার উচ্চ ক্ষমতায়তের ভিত্তিতে নয়, বরং শাসকদের কঠোরতা না থাকার ভিত্তিতে।(ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়া, প্রথম খণ্ড)

নামকা ওয়াস্তের মুজাহিদ জাহান্নামে যায়, আর তা শুধু এ কারণে যে, তার উদ্দেশ্য সত্যের কালিমা উঁচু করা ছিল না বরং নিজ জাতির মাথা উঁচু করা উদ্দেশ্য ছিল। তাহলে এ যুদ্ধবাজের জন্য কোন জান্নাতের দরজা খোলা হবে, যে সত্যের কালিমা উঁচু করার পরিবর্তে নিজ জাতির মাথা উঁচু করাও উদ্দেশ্য নয় বরং একটি তাগূতী শাসনব্যবস্থার শ্লোগানকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে? একজন সাধারণ জ্ঞানের মানুষও বাতিল শাসনব্যবস্থার প্রতি এরকম সহযোগিতাকে জায়েজ মনে করতে পারে না। যদি এ বিষয়ে আপনি উলামায়ে কেরামের ফাতওয়াসমূহের সমর্থনকে জরুরী মনে করেন, তাহলে নিচে উল্লেখিত ফাতওয়াগুলো দেখে নিতে পারেন-

আলিফ. গায়রুল্লাহর রাস্তায় কিতাল করার বিধান সম্পর্কে শামসুল আইম্মা সারখসী রহ. লিখেন:

"যদি কাফের বাদশার উপর অন্য কোন কাফের বাদশা হামলা করে তাহলে মুসলমানের জন্য জায়েজ নেই যে, সে নিজ কাফের বাদশার পক্ষে যুদ্ধ করবে। কারণ, এর দ্বারা মন্দের ও কুফরের প্রতিপত্তি ও সম্মান প্রকাশ পাবে, যার সহযোগিতা করা হারাম।"

(কিতাবুল মাবসুত, শামসুদ্দীন সারাখসী রহ, দারুল হরবের অধিবাসীদের বিবাহ ও ভিসা নিয়ে ব্যবসায়ীদের জন্য তাদের নিকট গমন সংক্রান্ত অধ্যায়, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮, মিসর ১৩২৪ হিজরী)

শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েজ নেই যে, সে কোন কাফেরের ঝাণ্ডাতলে যুদ্ধ করবে, যদিও যুদ্ধটা দ্বীনের দুশমনদের সাথেই হোক না কেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- "আমি প্রত্যেক ঐ মুসলমান থেকে মুক্ত, যে মুশরিকের সাথে থাকে।" এই হাদীস উল্লেখ করে তিনি দলীল পেশ করে বলেন যে-

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক ঐ মুসলমান থেকে মুক্ত, যে মুশরিকের সাথে থাকে অর্থাৎ যখন ঐ মুসলিম মুশরিকের ঝাণ্ডাতলে যুদ্ধ করে।"

(প্রাগুক্ত, কিতাবুস সিয়ার, পৃষ্ঠা: ২৪)

বা. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে বলতে গিয়ে লিখেন:

"বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, পরস্পর সাহায্য করার মাসআলা কী? তো তার হুকুম একটি নির্দিষ্ট মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এবং সেই মূলনীতি হলো: কুফর ও গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিজেই একটি গুনাহ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) "তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না।" *তো এই সাহায্য কখনও কোন কিছুর বিনিময়ে হয়, যাকে সাধারণের পরিভাষায় চাকরি বলা হয়। আবার কখনও কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হয়, যাকে সাহায্য বা অনুদান বলা হয়। এই উভয় প্রকারের শরয়ী হুকুম একই ধরনের। অর্থাৎ, যদি কাফেররা কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায় অথবা কোন মুসলিম শাসকের কাছ থেকে সে দেশকে জোরপূর্বক দখল করতে যায়, তাহলে এই পরিস্থিতে ঐ কাফেরদের চাকরি করাও হারাম এবং তাদের থেকে কোন কিছুর বিনিময় গ্রহন করা ছাড়াও সাহায্য করা হারাম। বরং কবীরা গোনাহ। কিন্তু যদি কাফেররা নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করে, অথবা এমন কোন দেশের শাসন ক্ষমতার ভার গ্রহন করতে ও সে দেশের ধন-সম্পদ জমা করতে চায়; যা আগ থেকেই তাদের দখলদারিত্বের অধীনে চলে আসছিল, আর এ কারণে যদি কোন মুসলমানকে চাকরিতে নেয়, তাহলে শরীয়তের জাহের/বাহ্যিক হালাত অনুযায়ী এই চাকরি গ্রহন করা জায়েজ মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ সাধারণ ইজারা/লীজ নেওয়া। যেমন- সেলাই কাজ, ব্যবসা ইত্যাদির মাসআলা দ্বারা বুঝে আসে। এমনিভাবে এমন কর্মচারীদের জন্য জায়েজ হবেই না কেন, যখন পূর্ববর্তী আকাবিরদের মুশরিকদের চাকরী করা প্রমাণিত আছে। কিন্তু যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে এটাও হারাম হওয়া থেকে খালি বিবেচিত হবে না; বিশেষ করে এই সময়ে। কেননা, এরা কাফেরদের কর্মচারীবৃন্দ। আরো বিশেষ কারণ হলো: যদি দ্বীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এমন চাকরী গ্রহণ করে, তাহলে দ্বীনের কতই না ক্ষতির উপলক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। সব থেকে ছোট যেই বিষয়টা প্রকাশ পায়, তা হলো: এর দ্বারা ঐ কাফের তাগূত লিডারদের খারাপ কাজে বাঁধা দেওয়ার ক্ষেত্রে 'মুদাহানাত' (চাটুকারিতা)-এর সৃষ্টি হয় এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান ও তাদের কল্যাণকামিতার হক আদায় করার ক্ষেত্রে দেখেও না দেখার ভান করা হয়। তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা হয় এবং তাদেরকে খুব বেশি ইজ্জত-সম্মান করা শুরু হয়। তাদেরকে মনিব, মালিক ও কেবলা বলা শুরু হয় এবং তাদের প্রশংসায় গীত গাওয়া হয়।"*

(ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়া, পৃষ্ঠা: ১৪)

শাহ সাহেবের এই ফাতওয়াকে মনোযোগ দিয়ে পড়ুন! হযরত শাহ সাহেব কাফেরদের আলাদাভাবে কর্মচারী হওয়ার ব্যাপারে, যেমন- কাপড় সেলাই করা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে দেওয়ার মত ব্যক্তিগত চাকরিকেও সাধারণ দৃষ্টিতে জায়েজ বলার পরেও গভীর পর্যবেক্ষণের পর বলেছেন, "এটা হারাম থেকে খালি না।"

তাহলে তার দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত কর্মচারীদের অবস্থা কী হবে, যারা ব্যক্তিগতভাবে নয়, বরং যাদের কর্মচারী হওয়ার অর্থ হল এই যে, নিজেদের উপর ও অন্যান্য ইসলামের অনুসারীদের উপর এই বড় গোনাহ ও বিশাল বড় মুনকারের থাবাকে ঢিল হতে দেয় না, যা তাদের উপর নেযামে হুকুমত তথা রাষ্ট্রীয় সংবিধান নামে শাসনকর্তা রয়েছে। অতঃপর শুধু এতকুটুই নয়, বরং এখানে আবশ্যকীয়ভাবে এমন কাজসমূহ আঞ্জাম দিতে হয়, যা সত্ত্বাগতভাবেই শরীয়তের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হারাম!

জ্বীম. মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী সাহেব ফিরিঙ্গী মহল্লী রহ. একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

"যেই চাকরিতে শরীয়ত বহির্ভূত আইন জারি করা অথবা জুলুমের আইন চালু করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকে; সেই চাকরি জায়েজ। আর যে চাকরিতে এগুলো করা লাগে, তা হারাম"

(দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২)

সঙ্গত মনে হচ্ছে বর্তমান যুগের কিছু উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে কতক বুযুর্গের মতামত আপনাদেরকে শুনিয়ে দেয়া। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর চিন্তা-চেতনার সব থেকে বড় ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার মাওলানা আব্দুল বারী নদবী রহ. এই মাসআলার আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর এই ফাতওয়া উল্লেখ করেন:

"তবে (কাফের প্রশাসনের) চাকরির ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু সতর্কতা জরুরি যে, যদি জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহলে এই কাফেরদের অধীনে শুধু শিক্ষকতা জাতীয় ঐ চাকরি করো; যাতে আদালতের অনুসরণ ইত্যাদির মত শরীয়তের বিধি-বিধানের সরাসরি বিরোধিতা করার প্রয়োজন না হয়। তেমনিভাবে যদি দেখ যে, নিজের জান মালের এমন কোন ক্ষতি হচ্ছে, অথবা সহ্য ক্ষমতার বাহিরে চলে যাচ্ছে, যে ক্ষেত্রে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে, তখন এতেও কোন সমস্যা নেই। ফুকাহাগণ এ সকল ক্ষেত্রে জুলুম দূর করা ও হক আদায়ের জন্য ঘুষকেও বৈধ বলেছেন।"

(মাসিক মা'আরিফ, জানুয়ারি ১৯৪৭, খণ্ড: ৯, সংখ্যা: ১, পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮)

এমনিভাবে একবার হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর কাছে একজন নায়েবে তহশীলদার আসল এবং তাঁর কাছে নিজের চাকরির ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করার মাধ্যমে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল যে, 'আমি এই ইংরেজ সরকারের চাকরিকে না-জায়েজ মনে করে ছেড়ে দিতে চাচ্ছি'। তখন তিনি তার উত্তরে বলেন:

"আমি যতটুকু বুঝেছি, তা হলো: আপনার যেহেতু অন্য হালাল জীবিকা নির্বাহের সহজ উপায় আছে, তাই আপনার জন্য এই চাকরি ছেড়ে দেওয়াই উচিত। যদিও সেই আহাম 'ইস্তেফতা[18]' আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে আপনি তার আলোচ্য বিষয় যা উল্লেখ করলেন, তার দ্বারা মনে হল সেটা সঠিক হওয়ার অধিক কাছাকাছি। আর আপনার বন্ধু-বান্ধবরা যে হুকুম[19] বললেন, তা আমার বুঝে আসে না, যদিও তারা আলেম হোক না কেন।"

স্পষ্টত: যে, যদি কোন অনৈসলামিক সরকারের চাকরির বিষয়টি সরাসরি না-জায়েজ না হয়, তাহলে তা ছেড়ে দেওয়ার ফাতওয়াও দেওয়া হবে না। সুতরাং মাদানী রহ. এর ফাতওয়া 'এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত' দ্বারা বুঝা যায় যে, এই চাকরি তার নিকট না-জায়েজ।

---

[18] এই আহাম ইস্তেফতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মাওলানা মওদুদী রহ. এর সেই প্রসিদ্ধ লিফলেট 'একটি আহাম ইস্তেফতা'। যে লিফলেটের বিষয়বস্তুর হাওয়ালা দিয়ে মাদানী রহ.-এর কাছে ফাতওয়া জানতে চাওয়া হয়েছিল।

[19] অর্থাৎ তার বন্ধু-বান্ধবদের হুকম। যার মাঝে অনেক উলামা-মাশায়েখও রয়েছেন। তারা এই বলেছিল যে, 'তুমি এই চাকরি কখনোই ছেড়ে দিও না। কেননা, মুসলমানদের ধর্মীয় কল্যাণের ফায়দা এতেই রয়েছে।'

বর্তমান ও পূর্বের উলামায়ে কেরামের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা করুন! যদিও এই ফাতওয়াগুলো বিভিন্ন চাকরি সম্পর্কে। কিন্তু সবগুলোর মধ্যেই হারামের আসল কারণ পাওয়া যায়। তা হলো: এই চাকরি দ্বারা অনৈসলামিক বিধান মানতে হয়। এমনিতে তো এই ফাতওয়ার মধ্যে এই মাসআলার প্রায় সব দিকই ফুটে উঠেছে। এজন্য যদি আপনি এই বক্তব্যগুলোকে এক জায়গায় একত্র করে পড়েন, তাহলে আপনার সামনে মাসআলা একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং জাহেলি শাসনব্যবস্থার এমন চাকরি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না, যাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম কাজও করতে হয়।

৩. সাধারণ কর্মচারীবৃন্দ

'গুনাহের ক্ষেত্রে সাহায্য' এর সর্বশেষ ও সাধারণ স্তর হল উপরোল্লিখিত বিশেষ চাকরি ছাড়া অন্য কোন চাকরি করা, যাতে কোন হারাম কাজ করা লাগে না। আর এই চাকরির মধ্যে নাপাকি শুধু এতটুকু যে, সে এক বাতিল নেযামের অধীনে চাকরি করছে। তার মধ্যে সত্তাগত কোন খারাপি নেই। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা এক জাহেলি শাসনব্যবস্থার সাহায্য করা হয়। এজন্য তাকে 'গুনাহের কাজে সাহায্য' করা থেকে বাহিরে বলা যাবে না। আর না গুনাহমুক্ত হওয়ার কথা দ্বীনের মেজাজ যারা বুঝেন তারা বলেছেন।

আল্লামা সারখসী রহ. যে উপরে উল্লেখিত ফাতওয়ার মধ্যে বলেছেন, "এর দ্বারা কুফরের সম্মান ও প্রভাব বাড়বে, যার সাহায্য করা হারাম।" এর দ্বারা মূলত: তিনি শরীয়তের ঐ স্বীকৃত মূলনীতির ঘোষণা দিয়েছেন। মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.এর কথাও কিন্তু এই মূলনীতিকেই ব্যক্ত করছে। হযরত থানবী রহ. যদিও "শিক্ষকতা প্রভৃতি" চাকরীকে "জীবিকা নির্বাহের আর অন্য কোন উপায় না থাকার" শর্তে জায়েজ বলেছেন, তথাপিও তার দৃষ্টি "গুনাহ ও জুলুমের কাজে পরস্পরে সাহায্য করিও না" এই আয়াতের দিকে লক্ষ্য করেছেন। বাস্তব কথা হলো: তাগুতি শাসনব্যবস্থায় এই সমস্ত চাকরি যদি গুনাহের কাজে সাহায্য না হয়, তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এমন যে, 'গুনাহের কাজে সাহায্য' এমন একটি থিওরি, বাস্তবে যার কোন বাহ্যিক রূপ নেই। সুতরাং বাহ্যিকভাবে দোষমুক্ত চাকরিকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে না-জায়েজ ঘোষণা দেওয়ায় আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না।" এই আয়াতের তিলাওয়াত তারতীর ও তাজবীদ সহকারে আদায় করা সত্ত্বেও এর কোন বাহ্যিক রূপরেখা থাকবে না। এমনকি কুফুরী সিস্টেমের গোড়াপত্তনকারীও এই গোনাহের কদর্যতা থেকে একদম সাফ-সুতরা হয়ে যাবে।

কিন্তু এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, এই সাহায্য খারাপ কাজে সাহায্যের সবচেয়ে হালকা স্তর এবং এর খারাপি অন্য দুই প্রকারের খারাপি থেকে অনেক কম এবং সাধারণ স্তরের অপছন্দনীয় কাজ।

নিরুপায় হওয়ার ক্ষেত্রে ছাড়

পরস্পর সাহায্যের যে ব্যাপারটি আছে, তার ইলমী বিশ্লেষণ এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক প্রকারের মাসআলার হুকুম শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তো এটাই। আর মূলত: কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েজ নেই যে, সে জাহেলী শাসনব্যবস্থার সাথে সাহায্যের ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পর্কও বহাল রাখবে। কারণ, এই শাসনব্যবস্থার সাথে কোন ধরণের সম্পর্ক রাখা; এই শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও স্থায়ী করার নামান্তর। আর শরীয়তের মৌলিক নিয়ম-নীতি ও মজবুত মূলনীতিসমূহের একটি এটাও যে, জাহিলিয়্যাত ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখবে না এবং আল্লামা সারখসী রহ. উক্তি: "কুফর, শিরকের কোন সাহায্য করা হারাম।"

কিন্তু শরীয়তের আরেকটি মূলনীতি হল, অপারগ অবস্থায় হারামও হালাল হয়ে যায়, (فَمَنِ اضْطُرَّ...) "যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে...আয়াতের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে আমাদের সামনে মুসলমানদের যে অবস্থাসমূহ আছে, তা ঐ অবস্থা থেকে একেবারে মুক্ত না, যাকে বাধ্যকরণ বলা যায়। সুতরাং যে ক্ষেত্রে বাধ্যকরণ ও নিরুপায় অবস্থা পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে 'গুনাহের কাজে সাহায্য করা'র হুকুম বহাল থাকবে না।

তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে তো এই কথা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই মাসআলা খুবই স্পর্শকাতর। বিশেষ করে এই জামানায় যখন ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ নেই বললেই চলে। তাছাড়া চিন্তা-চেতনার অবনতি, সাহসের অভাব, ছাড় পাওয়ার মানসিকতা মানুষের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। স্বভাবগতভাবেই মানুষ

সহজ হওয়াকে পছন্দ করে। সে চায় ছাড়ের ভিতর ডুবে থাকতে। এখন যদি ঐ ছাড় ও সহজ করণের ভার তার উপর দেওয়া হয়, তাহলে সব সুযোগ সে গ্রহণ করবে এবং এটাকেও কম মনে করবে। এজন্য খুব বিচক্ষণতার সাথে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আসুন দেখা যাক যে, কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে শাসিত মুসলমানরা বাস্তবে কী কী অপারগতার সম্মুখীন হতে পারে এবং কোন অপারগতায় অপারগ হয়ে সে তাদের সাথে সাহায্যমূলক কাজ করতে পারে! আসলে যদিও সর্বাবস্থায় এটাকে গোনাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতাই বলা হবে। তথাপিও কোন কোন অবস্থায় সে অপরাগতার সুযোগ গ্রহন করতে পারবে ও কী অনুভূতি নিয়ে গ্রহন করতে পারবে?

অপারগতার বাস্তব সূরত

জাহেলি শাসনব্যবস্থায় এই পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাস্তবে অপারগ হওয়ার দু'টি সূরত হতে পারে।

প্রথমত: শাসিত মুসলমানদেরকে কাউন্সিলে অংশগ্রহণ বা সরকারি চাকরি করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধ্যকরণ।

দ্বিতীয়ত: যদি কোন মুসলমান জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতায় উপনীত হয় এবং জীবনধারণ পরিমাণ জীবিকা উপার্জন করার ক্ষেত্রে জাহিলী ব্যবস্থায় চাকরি করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় না থাকা।

১. সরকারের বাধ্যকরণ

প্রথম সূরতের ক্ষেত্রে যে অপারগতার সম্পর্ক, তা বাস্তবে পাওয়া যাওয়ার ঘটনা খুব কম। তারপরেও যদি আমরা ধরে নেই যে, কোথাও এই বিচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য অপারগতার সূরত বাস্তবে পাওয়া যায়, তাহলে তার জন্য কাউন্সিলে যোগদান করা এবং কিতাব সুন্নাহর বিপরীত আইন বানানোর ক্ষেত্রেও সে লোক মাযুর। এমনিভাবে পারস্পরিক সাহায্য করার আরও যত সূরত হতে পারে, সেসব সূরতের গোনাহের চাইতে এ স্তরের গোনাহ লঘু হবে। কারণ, মানুষের যখন জানের ভয়ে সাময়িকভাবে মুখে সুস্পষ্ট কুফুরী কথা বলার অনুমতি আছে- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ... (তবে যার উপর জবরদস্তি করা হয়েছে...আয়াতের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য) তাহলে আপেক্ষিকভাবে তার চেয়ে হালকা গুনাহ করার ক্ষেত্রে কেন অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না?

২. জীবিকা নির্বাহের ওজর

অপারগ অবস্থার আরেকটি সূরত বাকি আছে। আর তার সম্ভাবনা সর্বদাই আছে এবং জীবনধারণ পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থাও যদি এই সাহায্য ছাড়া না চলে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার কুফুরী শাসনব্যবস্থার চাকরিকে গ্রহণ করার সুযোগ থাকা উচিত। তবে এ অবস্থায়ও দুইটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। তা হলো:

১. এটি কোন এজতেমায়ি পলিসি না, বরং এটি পুরোটাই ব্যক্তি পর্যায়ের বিষয়। অর্থাৎ জাতি অপারগ হয় না, ব্যক্তি হয়। জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে এমন অপারগতা যে, জাহিলী শাসনব্যবস্থায় চাকরি করা ছাড়া জীবন বাঁচে না[20]; তা কোন জাতির হতে পারে না বরং তা ব্যক্তি পর্যায়ে হতে পারে। সুতরাং এটা কোন জাতির অর্থনৈতিক পলিসি হতে পারে না। জাতির সমষ্টিগত পলিসি তো তার বিপরীত হবে। সাধারণভাবে তারা এই কাজের নিচুতা বর্ণনা করবে। কারণ, এটা তো আসলেই একটি খারাপ কাজ। যদি কোন কারণে কারো জন্য এটা বৈধ হয়ে যায় তাহলে এর অর্থ এটা নয় যে, সে এটাকে গনিমত মনে করবে। আর অন্যরাও তার এই 'সফলতায়' বাহ বাহ দিবে। তাকে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না ঠিক, কিন্তু তার এই অবস্থার উপর কেউ খুশি থাকাও সম্ভব না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি জাতির মানসিকতা এই অবস্থাকে সহ্য করে নেয়। আর এই বাতিল শাসনব্যবস্থাকে যদি জাতির সফলতা ও উন্নতির পলিসি মনে করে। তাহলে তার একটিই ফলাফল হবে তা হল, জাতির সকল সদস্য এই অপারগ অবস্থাকে নিজেদের চাদর বানিয়ে নিবে। আর যেই খারাপির মূলোৎপাটন করা জীবনের বড় দায়িত্ব ছিল, এখন তার সংরক্ষণে ও উন্নতির জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম মেহনত করে যাবে। শেষ পর্যন্ত ইসলামী শাসনব্যবস্থা তাদের সামনে একটি বেহুদা জিনিসে পরিণত হবে।

---

[20] যে অপারগ অবস্থায় শুকর খাওয়া বৈধ হয়ে যায়। এই সমস্ত চাকরির স্তর/অবস্থা তার (শুকর খাওয়া বৈধ হওয়ার সূরত) থেকে অকাট্যভাবেই ভিন্ন হবে না।(প্রকাশক, মাসিক "যিন্দেগী" রামপুর)

২. এই অপারগ অবস্থারও বিভিন্ন স্তর আছে। যে সমস্ত ব্যক্তিরা নিজেদের আর্থিক অপারগতার কারণে মন না চাইলেও কোন জাহেলি শাসনব্যবস্থার অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের কাজের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। অপারগ হওয়ার অর্থ এটা কখনোই নয় যে, এই শাসনব্যবস্থায় যেকোনভাবে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। এমনিভাবে তাদের অধীনে যে কোন চাকরি করত পারবে এবং সব ধরণের চাকরিকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে। যেমনিভাবে তাদের সংবিধানের অধীনে ডাকবিভাগ, রেল-বিভাগ, টেলিফোন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে কাজ করা জায়েজ[21], তেমনিভাবে ব্যাংকিং, মদ্যশালা, আদালত ও সেনাবাহিনী প্রভৃতি মন্ত্রণালয়েও নিজের আল্লাহ প্রদত্ত যোগত্যর সওদা করে বেড়াবে, এমনকি যদি সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য ডাকা হয়, তাহলে সে এমন মারাত্মক কাজের জন্যও তৈরী হয়ে যায়, আর ভাবে যে, কোন অসুবিধা ছাড়াই তার জন্য সে কাজে সহযোগিতা করার অনুমতি আছে! (আসলে বিষয়গুলো মোটেও এমন নয়)

এক্ষেত্রে সঠিক মত হলো: যদি সরকারি চাকরি ছাড়া তার অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহলে শুধু দ্বিতীয় স্তরের চাকরি করতে পারবে। যা সরাসরি হারাম না, বরং হারামের মাধ্যম। যাতে দ্বিগুণ গুনাহ নেই বরং এক গুনাহ। যাতে মানুষ যতদূর সম্ভব কুফুরী নেযামের সাহায্য ও তাকে শক্তিশালী করা থেকে বিরত থাকতে পারে। যাকে সে উসূলগতভাবে ও আকীদাগতভাবে ভুল কাজ মনে করে। এমনিভাবে সে যেন গুনাহের কাজে সরাসরি সাহায্য করতে না হয় এবং সংসদে বসে নিজের উসূলী আকীদার বিপরীত কাজ করতে না হয়। ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, আদালত, মদ্যশালা ও ব্যাংকিং-এর মত মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরিতে জয়েন করে সরাসরি বা মাধ্যম হয়েও দ্বিগুণ গোনাহের কাজ করা যাবে না। কারণ, কুরআনুল কারীম যেখানে নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিসের দ্বারা ফায়েদা গ্রহনের অনুমতি দিয়েছে, সেখানে এই শর্তও জুড়ে দিয়েছে যে, মানুষ যেন ‘প্রয়োজনের সীমা’ থেকে অগ্রে বেড়ে না যায়-

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿البقرة: ١٧٣﴾

“অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালজ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।” (সূরা বাকারাহ: ১৭৩)

‘প্রয়োজনের সীমা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মানুষ বাস্তব প্রয়োজনের বেশি হারামের জিনিস ব্যবহার করবে না। এমনিভাবে আরো উদ্দেশ্য হলো, সর্ব নিম্নস্তরের হারাম জিনিস ব্যবহার করবে। যে স্তরের হারাম জিনিস বা মাধ্যম গ্রহনের দ্বারা উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, তার থেকে উচ্চ স্তরের হারাম জিনিস বা মাধ্যম গ্রহন করা যাবে না। সন্দেহযুক্ত বা মাকরুহ পানি বিদ্যমান

[21] মূলত: এই সমস্ত মন্ত্রণালয় কুফর ও শিরকের সম্মান ও দাপট বৃদ্ধির সাথে সাথে আজ তার পরিচালনাকারীরা মৌলিক মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সামর্থ অর্জন করে ফেলেছে। বরং তাগুতি শাসনব্যবস্থা নিজেদের মন্দ চেহারার উপর পর্দা ফেলানোর জন্য জনকল্যাণমূলক সেবায় নিয়োজিত এই সমস্ত মন্ত্রাণালয়ের হাওয়ালা দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে ফেলেছে। রেল, ডাক ও টেলিফোন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যাপারে আমাদের মাথায় এই বিষয়টি রাখতে হবে যে, ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশে আসার পর সর্বপ্রথম এই সমস্ত মন্ত্রণালয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। যা তাদের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে কর্তব্য বিধায়ক ছিল। বর্তমানেও তাগুতী শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা এগুলির দ্বারা ঐ রকমই সুবিধা গ্রহন করছে। এমনিভাবে বাহ্যিকভাবে ক্ষতিকারণ নয় বলে যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মনে করা হচ্ছে, তা-ই আজ কুফরের সবচেয়ে বড় ধারালো হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। বাতিলদের অনৈসলামিক/শরীয়ত বিরোধী পলিসিগুলোর পরিচিতি ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার জন্য সাধারণ জনগণের সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত মন্ত্রণালয়গুলি বর্ণানাতীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নির্বাচনের ব্যালেট পেপার তৈরী করা থেকে নিয়ে নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত, ফ্যামেলি প্লানিং দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, সেক্স ইনজেকশন দ্বারা এইডস-এর ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী করা পর্যন্ত।(এগুলোর উদ্দেশ্য সামাজিকভাবে লজ্জা-শরমের প্রাসাদকে ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।) আমাদের জানার বাহিরে না জানি আরও কত জঘণ্য কাজ এই মন্ত্রণালয়গুলির মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। (তা আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন) মুসলিম সমাজের জন্য তা মারাত্মক পর্যায়ের ধ্বংসাত্মক এই জন্যও যে, যখন একজন উস্তাদ বা ডাক্তার; যাকে সমাজের চোখে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, এখন যদি তাদেরকে এই কাজগুলি করতে দেখা যায়, তাহলে তা নীতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই জন্য বাতিল শাসনব্যবস্থার সাথে আপাদমস্তক সম্পর্ক কায়েমের পর কোন মন্ত্রণালয় ক্ষতি থেকে বাঁচতে পেরেছে, তা কল্পনাতীত। এমনিভাবে গত তিন বছর পূর্বে তা জনসম্মুখে প্রকাশও হয়েছিল। (প্রকাশক, মাসিক “যিন্দেগী” রামপুর)

থাকাবস্থায় নাপাক পানি দ্বারা পিপাসা নিবারণের ফতোয়া দেওয়া হবে না। এমনিভাবে নাপাক পানি বিদ্যমান থাকাবস্থায় মদ পান করে জান বাঁচানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর কথাকে আবারও স্মরণ করুন! "যদি জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহলে এই কাফেরদের অধীনে শুধু শিক্ষকতা জাতীয় ঐ চাকরি করো; যাতে আদালতের অনুসরণ ইত্যাদির মত শরীয়তের বিধি-বিধানের সরাসরি বিরোধিতা করার প্রয়োজন না হয়।" এমনিভাবে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.-এর কথাটিও আবার স্মরণ করুন! যে কথাটি তিনি عند التعمق 'গভীর দৃষ্টি' বাক্য দ্বারা শুরু করেছেন।

আর্থিকভাবে নিরুপায় হওয়ার কারণে জাহিলী শাসনব্যবস্থার অধীনে চাকরি তখনই জায়েজ হতে পারে, যখন উপরোল্লিখিত দুই মূলনীতির প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখা হবে। এরপর শুধু দ্বিতীয় স্তরের চাকরিই নয়, বরং প্রথম স্তরের চাকরিও গ্রহণ করতে পারবে। যদিও বাস্তব অবস্থার আলোকে দেখা যায় যে, এই রকম সূরত খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা, উসূলীভাবে প্রথম স্তরের চাকরি তখনই গ্রহণ করতে পারবে, যখন দ্বিতীয় স্তরের একগুণ গুনাহওয়ালা চাকরিও পাওয়া না যাবে। আর অভিজ্ঞতা বলে, এই প্রথম স্তরের চাকরি পাওয়া দ্বিতীয় স্তরের চাকরি পাওয়ার তুলনায় অনেক কঠিন। তার জন্য অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। অবশ্য যাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা আছে; যা দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে, আদালতের জজ-উকিল হতে পারে; তারা দ্বিতীয় স্তরের সাধারণ চাকরির অধিক যোগ্য বলা যেতে পারে। তবে শর্ত হল, তারাও এমন চাকরি পছন্দ করতে হবে এবং সহজে এমন চাকরি পেতেও হবে। এই শর্তসাপেক্ষে যে, তারা নিজেরা এমন চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট। এছাড়া এই প্রথম স্তরের চাকরি এমন, যার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয় এবং অনেক বছর একটি বিশেষ বিষয়ের উপর লেখাপড়া করতে হয়। তারপর গিয়ে মানুষ এমন যোগ্য হয় যে, তার দ্বারা এই প্রথম স্তরের চাকরির কাজ নেওয়া যেতে পারে।

এমন হয় না যে, আজ একজনের আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হল, তখন সে চিন্তা করল যে, এখন এই ধরনের চাকরি করা ছাড়া আমার সমস্যার সমাধানের আর কোন উপায় নেই। তারপর সে সরকারী অফিসে চাকরির দরখাস্ত জমা দিল আর সরকার তাকে চাকরি দিয়ে দিল। এজন্য বাস্তবে এই প্রথম স্তরের চাকরি বাধ্য হয়ে গ্রহন করা হয়েছে, তা কল্পনাতীত ব্যাপার বটে। এই চাকরি কেবল সেই পায়, যে দীর্ঘদিন এর জন্য এক মনে প্রস্তুতি নিয়েছে। তার অন্তর এই চাকরিকেই খুঁজেছে। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি বলা যায় যে, এই ব্যক্তি এই চাকরি গ্রহণে বাস্তবিক অর্থেই অপারগ ছিল?

কিন্তু আমরা বিরল ও দুর্লভ অবস্থাকেও উপেক্ষা করত পারি না। সুতরাং বাস্তবেই যদি দু' একজন মানুষ অপারগ হয়ে পড়ে এবং পূর্ণ ইখলাসের সাথে বুঝতে পারে যে, নিরুপায় হওয়ার সব শর্ত তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে নিঃসন্দেহে সে এই পথে পা বাড়াতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এটা যত বড় গুনাহ, ঠিক ততখানি অপারগ হলেই কেবল সে এই পথে পা বাড়াতে পারবে। তারপর তার মনে এর প্রতি এত বেশী পরিমাণ অপছন্দ ও অসন্তুষ্টির জযবাও জাগরুক রাখতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি খুবই খারাপ কাজ করছি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আর আমাকে এর থেকে উদ্ধার করুন। শুধু দু'আ করলেই হবে না, বরং নিজে পুরোপুরি অন্য ব্যবস্থার চিন্তা করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব এই নাপাক পোশাক খুলে দূরে নিক্ষেপ করবে।

কুফুরী শাসনব্যবস্থার সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রথম স্তরের চাকরি করার ব্যাপারে আমাদের যতটুকু অবগতি আছে, সেই হিসাবে জীবন ধারণ পরিমাণ আর্থিক সংকটের কারণে এই চাকরি গ্রহন করার অপারগ অবস্থা সর্বাবস্থায় 'খেলাফে কিয়াস'। এজন্য সংসদ সদস্য হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপনেরই দরকার নেই।

অপারগ হওয়ার অবস্থার প্রয়োগ

এখন কথা হলো: একজন মানুষ কখন অপারগ হয় এবং কতক্ষণ থাকে? অর্থাৎ একজন মানুষ কখন এই অতিশয় মন্দ ও জাহেলি শাসনব্যবস্থার অধীনে জবরদস্ত সহযোগিতামূলক চাকরি শুরু করতে পারে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত এই সহযোগিতামূলক চাকরি করতে পারবে? তো এ বিষয়টি অন্যের তুলনায় নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। মানুষের যত বেশি ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত হবে, ঠিক ততখানিই সে এই ছাড় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। বাস্তবিক অর্থে কেউ অন্যের আসল সমস্যা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। এ সম্পর্কে কথা বললে কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তাই আমরা এখানে শুধু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর একটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আলোচনা ক্ষান্ত করব। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

রহ.-এর চিন্তা-চেতনার সব থেকে বড় ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার মাওলানা আব্দুল বারী নদবী রহ. এ ব্যাপারে হযরত থানবী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন:

"বরং যদি ঘটনাক্রমে কেউ এমন কোন চাকরিতে ফেঁসে যায় এবং তার কম হিম্মতের দরুন আশংকা হয় যে, এই চাকরি ছেড়ে দিলে সে আরও বড় কোন ফেতনায় পড়ে যাবে, যেমন- আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে পারবে না এবং এই পেরেশানীতে নিপতিত হয়ে আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা শুরু করবে। নামায রোযার মত ফরয ঠিকমত আদায় করতে না পারার দরুন দিলের অবস্থা খারাপ হতে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় অন্য কোন চাকরির বন্দোবস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐ চাকরিকে গুনাহ মনে করে এবং ইস্তেগফারের সাথে করতে থাকবে এবং খুব চেষ্টা করবে যেন খুব দ্রুত অন্য কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়। যদি এভাবে সারা জীবনও সে তার চেষ্টায় সফল হতে না পারে, তথাপিও তার দ্বারা চেষ্টার হক আদায় হবে। শুধু চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।"

আমাদের দৃষ্টিতে অপারগ অবস্থার এটা সর্বনিম্ন ও সবচেয়ে সহজ মাপকাঠি। সম্ভবত: মাওলানা থানবী রহ. বর্তমান যুগের মানুষেদের কম হিম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার এত অসাধারণ ছাড় দিয়েছেন। তথাপিও উসূলী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কথা একদম সঠিক। তবে তাঁর এই একটি কথা ভালোভাবে নোট করে রাখার উপযুক্ত যে, "এমতাবস্থায় অন্য কোন চাকরির বন্দোবস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐ চাকরিকে গুনাহ মনে করে করতে থাকবে।"

অপারগ হওয়ার অবাস্তব সূরত

এতক্ষণ অপারগ হওয়ার বাস্তব সূরত ও হালাত এবং তার সর্বোচ্চ প্রশস্ততার কথা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গোলামী ও অধীনস্থতা শুধু একটি খারাপিই নয় বরং এটি অসংখ্য, অগণিত খারাপির জন্মদাতা। শারীরিক গোলামীর বয়স যখন দীর্ঘ হয়ে যায়, তখন দখলদাররা নানা রঙের নতুন নতুন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানে। তখন আস্তে আস্তে শারীরিক গোলামীর সাথে সাথে মানসিক গোলামীরও সূত্রপাত হয়। ঐ সময় মানসিকতার পরিবর্তন হয়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। অনুভূতি নষ্ট হয়। ভালো খারাপির মাপকাঠি উল্টে যায়। এটি কুদরতি একটি নেযাম, যা থেকে মুসলমানও মুক্ত নয়। এজন্য এটা অসম্ভব নয়, যদি অপারগ হওয়ার ক্ষেত্র পরিবর্তন করা হয় এবং বাধ্য হওয়ার এমন সূরত বের করা হয়, যা একেবারেই অপ্রাকৃতিক ও অবাস্তব। অতঃপর কুফুরী নেযামের সাহায্যের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর এটা শুধু কাল্পনিক ধারণা-ই নয় বরং চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা।

জাতীয় স্বার্থ

অপারগ হওয়ার অবাস্তব সূরতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত সূরত হল জাতীয় স্বার্থ রক্ষার বুলি। শাসিত জাতির সবচেয়ে বড় অপরাধ এই হয় যে, সে শাসিত। এই অপরাধের পায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে সে নিজের আত্মমর্যাদাবোধ, নিজের সম্পদ, নিজের ধর্মীয় পরিচয়, নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতি, নিজের দ্বীন ও নিজের জীবনাচার পদ্ধতিসহ সবকিছুকে আঘাতপ্রাপ্ত দেখতে বাধ্য হয়। এর চিকিৎসা অনেক কঠিন। বিশেষ করে গোলামি মানসিকতার লোকেরা সর্বদাই সহজটাকে তালাশ করে।

এদিকে তাদের উপর চেপে বসা দাপটওয়ালা শাসকরা নিজেদের ফায়দা বিবেচনায় জনগণের যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ধান্ধা বাস্তবায়নের চেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং এর বিপরীতে জনগণের সামনে কিছু জাতীয় উপকারিতা তুলে ধরার প্রয়াস চালায়। তখন চাহিদা ও চাহিদার দাবি পূরণের এই "দুই সৌভাগ্যের শিং" আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ ফলাফল প্রকাশ করে। অধীনস্থ জাতি তাদের এই দাবী পূরণ করার মাধ্যমে ঐ শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কাজে লেগে পড়ে। ঠিক এই অবস্থা মুসলমান জাতির ক্ষেত্রেও হয়, যখন তারা দীর্ঘকাল যাবত অধীনস্থ জীবন-যাপন করে। তারা দেখে জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণের সাথেই বর্তমান সরকারের সহযোগিতামূলক আচরণের শর্ত লাগানো আছে। এখন যদি নিজেদের ধর্মের মূলনীতিতে অটল থাকি, তাহলে জাতি অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যেহেতু জাতীয় উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল (অথচ কুরআন তা অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল বলেছে)। এজন্য পুরো জাতিকে সরকারি চাকরির মাধ্যমে অনেক বেশি উপকার গ্রহণ করতে হবে। এভাবে বাছ-বিচারহীনভাবে সব বিভাগে চাকরি করা পুরো জাতির যৌথ পলিসিতে পরিণত হয়। সহযোগিতার পলিসি এ পর্যন্ত থাকলেও তো কোন রকম সবর করা যেত, কিন্তু এই জযবা বেড়ে একজন মুসলমান অনিচ্ছায় ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে, যেখানে আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে সংবিধান বানানো হয়। যেখানে (সংসদে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর আইন প্রণয়নের হক্বসমূহকে ছিনতাইকারী তাগুতরা একত্রিত হয়। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাকিমিয়্যাতকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়। যা শুনে আত্মমর্যাদাশীল মু'মিনের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে বলে-

"হায় আফসোস! আমি যদি এ পথের পথিককে না চিনতাম"

এটা স্পষ্ট যে, এটা হল জাহেলি শাসনব্যবস্থার সাথে পরস্পর সহযোগিতার একটি সিঁড়ি। আর এটা একজন মু'মিনের বুনিয়াদী ঈমানী চিন্তা-চেতনার সুস্পষ্ট বিপরীত। কিন্তু আমরা জানি যে, যারা এই কাজে লিপ্ত; তারা অধিকাংশ সময়ই নিজেদের ধারণা অনুপাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে মুখলিছ হয়ে থাকেন। সে জাতির ব্যথায় ব্যথিত। সে মনে করে মুসলমানের হক এভাবেই বাঁচানো সম্ভব। যদি এখন আমরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার কুরবানী না করি, তাহলে দুশমন আমাদের উপর পুরোপুরি চেপে বসবে। আর সামনে যে আইন তৈরি করা হবে, তাতে তারা আমাদের কোন হক্কের চিন্তা করবে না। অন্যভাবে বললে এই লোকেরা নিজেদেরকে অপারগ মনে করে। নিরুপায় অবস্থা ধরেই যা করার করে... কিন্তু এটি নিরুপায় হওয়ার মূলনীতির সম্পূর্ণ ভুল প্রয়োগ এবং নিরুপায় অবস্থার ছাড়ের অপাত্রে ব্যবহার। অর্থনৈতিক মজবুতির জন্য বাছ-বিচার ছাড়া সব চাকরির অনুমতি দেওয়া তো পুরোপুরি বস্তু পূজার চিন্তা-চেতনা।

এই হযরতদের একথা জানা নেই যে, মুসলমানদের উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতির মাঝে নয়। তাদের উন্নতি হলো: দ্বীন ও আখলাকের উন্নতির মাঝে। ঐ মুসলমান কী উন্নতি করবে, যে নিজের সম্ভাব্য আর্থিক উন্নতির জন্য নিজের আখলাক এবং দ্বীনকে বরবাদ করে দেয়?

বাকি থাকল ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা জাতির স্বার্থে সংসদে যাওয়াকে জরুরি মনে করে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যাদেরকে ইখলাসের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় মনে করা হয়। তারা বাস্তবতা, চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মারাত্মক অসামঞ্জস্যতায় লিপ্ত। তার উদাহরণ হল- 'ঐ নাদান মায়ের মত, যিনি অন্ধ মাতৃ মমতায় তাড়িত হয়ে তার অসুস্থ ছেলেকে সব ধরণের খাবার খাওয়ায়। সে বাহ্যিকভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করে। অথচ সে চিন্তা করে না যে, যে রোগী আগামীকাল মারা যেত, তার এতো খাওয়ানোর ফলে সে তো আজকেই মারা যাবে। সে তাদের কথা পছন্দ করে না, যারা তাকে এই সব খাবার খাওয়াতে নিষেধ করে। বরং সে তাদেরকে এই বাচ্চার দুশমন মনে করে। সে মনে মনে বলে, তারা আমার ব্যথিত মনের ব্যথা কি করে বুঝবে? আমার কলিজার টুকরা ছেলের কষ্ট/চাহিদা তারা কী করে বুঝবে?' এখানে একজন মায়ের তার সন্তানের প্রতি স্বভাবগত মুহাব্বত ও সহমর্মিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে? পারবে না। কিন্তু দুনিয়ার কুদরতি নেযামও কি এই অন্ধ মুহাব্বতকে প্রশ্রয় দেবে এবং ধারাবাহিকভাবে তার পেট নষ্ট হওয়ার মত খাবার খাওয়ানোর পরেও কি সে তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে?

ঠিক এটাই হল জাতীয় স্বার্থের "কল্যাণকামিতার" কথা বলে যারা নিজেদের কিছু দুনিয়াবি স্বার্থে জাতির রগে ছুরি চালায়। তারা ভেবে দেখে না যে, তারা কী হারাচ্ছে এবং এর বিনিময়ে কী সামান্য ফায়েদা অর্জন করছে? তারা ভেবে দেখে না যে, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি তবে দ্বীনের কবর রচনা করা? তারা ভুলে যায় যে, তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্য জাতির অনুকরণ নয় বরং পুরো বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া। তাদেরকে এজন্যই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। ইসলাম নামের খোদায়ী নেযাম নিজে পালন করবে এবং অন্য মানুষকে দাওয়াত দিবে। এজন্য নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। কিন্তু বাস্তবে কাজের দ্বারা তারা বুঝায় যে, মুসলমানও জীবনাচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বস্তুবাদী জাতির মত একটি জাতি। তাদের কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-বিধান নেই, স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনীতি নেই, কোন টার্গেট নেই এবং রাজনীতির কোন নীতিমালাও নেই।

একটু খেয়াল করুন! যে ব্যক্তি আইন প্রণয়নকারী সংসদে যোগ দেয়, তাদের আইন প্রণয়নের মূলনীতিকে মৌখিকভাবে পাশ করে, অথবা কার্যত স্বীকৃতি দেয়। 'সর্বোচ্চ ক্ষমতা গণতন্ত্রের, আল্লাহর না' এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়নে জনপ্রতিনিধিত্ব করে। আইন হয়ে যাওয়ার পর এর উপর দস্তখত করে। এরপর যখন এটা বাস্তবায়ন হয়ে যায়, তখন সে এর আইন অনুযায়ী ইলেকশন করে। আর এক এক কদমে ইসলামের নির্বাচন পদ্ধতিকে কাজের মাধ্যমে পরিত্যাগ করে। তারপর আইন প্রণয়নকারী সংসদে আসন গ্রহণ করে এবং সে এই শপথ গ্রহণ করে, "আমি সংবিধানের, দেশের ও আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।" আবার সাধারণভাবে এই শপথ এমন এক খোদার নামে করে থাকে, যার আনুগত্য করা ছাড়া, যার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ছাড়া মৌলিকভাবে অন্য কারো নির্শত আনুগত্য করা, তার নাযিলকৃত শরীয়াহ অনুযায়ী হারাম। তথা আল্লাহর নামে শপথ করে। তারপর কুরআন সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য শরীয়াহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করে...!

ঐ ব্যক্তিই, ঐ নামধারী মুসলিমই, যদি স্বীয় মসজিদে এসে- إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না) এর বাস্তবতা বুঝাতে গিয়ে বলে- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।) এই আয়াত বলে খুব গরম বক্তৃতা দেয়, আর দুনিয়াকে- أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم (তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর, যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে) এর শাহী ফরমান শুনিয়ে দেন এবং وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ(আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত) বলে উম্মতে মুসলিমার ফাযায়েল ও উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সাহিত্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক বয়ানের মাধ্যমে মোতিসদৃশ কথামালার বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর কথা ও কাজের সাথে তার এই দ্বিমুখী আচরণ দু'এক দিনের নয়, বরং যুগের পর যুগ তার যিন্দেগী এমনভাবে চলছে। তাহলে তার এই প্রকাশ্য অবস্থা দ্বারা দুনিয়ার মানুষ তাকে কি মনে করবে? সে অন্য জাতির সামনে কোন উম্মতের সাক্ষী হবে? তার এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা দ্বীনের ভিত্তি শক্ত হবে না ঢিলা হবে?

যদি কেউ আজ পর্যন্ত নিজস্ব মূলনীতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেই আমলীভাবে তার বিরোধিতা করে প্রতিষ্ঠা করতে পারত, তাহলে না হয় মুসলমানরাও এমনটি করতে পারত। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটেতে দেখা যায়নি। তাই মুসলমানদেরকে মনে রাখতে হবে যে, তাদের জন্য দুনিয়ার নীতি কখনো উল্টে যাবে না।

মৌলিক ভুল

এই ব্যাপারে মৌলিক ও বুনিয়াদী ভুল হলো: ঐ বিষয়ে যার আলোচনা উপরে করেছি। অর্থাৎ মানুষ নিরুপায় অবস্থার ছাড়কে পুরো জাতির সাথে এবং জাতির যৌথ পলিসির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দেয় যে, যেভাবে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত: এই ছাড়কেও জাতীয় পলিসি বানিয়ে নেয়। তারপর এটাকে এমন স্থিরতার সাথে ও শান্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে যে, মনে হয় যেন এটাই জাতির আসল রাস্তা। অথচ এই দু'টি বিষয়ই ভুল। কুরআন তো- وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে) এবং غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ (অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন করা ব্যতীত) এমন শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে। هَنِيئًا مَّرِيئًا (স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করা) হিসাবে নয়।

আর অপারগ অবস্থায় ইসলামী আকীদার বিপরীত কথা বা কাজ করার অনুমতি ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে, জাতিকে নয়। আর যদি ব্যক্তির উপর জাতিকে কেয়াস করাও হয়, তাহলেও এর দ্বারা কোন জাহেলি নেযামের উপর স্থায়ী হওয়া বা তার ধারাবাহিক সহযোগিতা করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এক্ষেত্রেও তার অনুভূতি ও শর্তাবলী এমন হতে হবে, যেমন কোন ব্যক্তি হারাম দ্বারা তার প্রয়োজন পুরা করার সময় হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটাকে খুবই অপছন্দ করবে। খুব কম উপকার অর্জন করবে। খুব জলদি এ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে যাবে। এই অপারগ অবস্থায়ও সে কোন হালাল বা ভাল উপায় খুঁজবে। তার মাঝে অস্থিরতা থাকবে। সবসময় মুখে এটার মন্দত্ব বর্ণনা করবে এবং আত্মিকভাবে এটা নিয়ে চিন্তিত থাকবে। কিন্তু যদি এসব কোনটাই না থাকে, তাহলে মূলত: এখানে অপারগ অবস্থার সর্বোচ্চ অপব্যবহার হবে। এটা যেন নিজস্ব মত ও চাহিদাকে পূরণ করার জন্য কুরআনের আয়াতকে ঢালস্বরূপ বানানো হবে।

দ্বীনের জিম্মাদারদের বিশেষ দায়িত্ব

এই ব্যাপারে দ্বীনের জিম্মাদারদের অবস্থান খুবই নাজুক। দ্বীনের ব্যাপারে ভুল কথা বলার দ্বারা অন্যদের দ্বারা যে ক্ষতি না হয়, এই হযরতদের দ্বারা সে ক্ষতি হয়। কোন জাতির জন্য এটা খুবই দূর্ভাগ্যের কথা যে, যারা মানুষকে জাহিলিয়্যাতের নিচের স্তর থেকে টেনে উপরে নিয়ে আসবে, তারাই উৎসাহী হয়ে অন্যদের সাথে সহচর হয়ে জাহিলিয়্যাতে লিপ্ত হয়। এর দ্বারা বাহিরের দুনিয়ায় তো আছেই, নিজেদের ধর্মের লোকদের মনেও একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আসলে ইসলামের নিজস্ব কোন জীবনব্যবস্থা নেই এবং মুসলমানদের জন্য বিলকুল জায়েজ আছে যে, সে যেকোন রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিবে। এমন ধোঁকাপূর্ণ সুখ্যাতি বিরাজমান থাকাবস্থায় আইন প্রণয়নকারী সংসদে যোগদান করা 'গুনাহের কাজে সাহায্য করা'র ঐ স্তরের হবে না, বর্তমানে সে যে স্তরে আছে। বরং এ সকল প্রতিবন্ধকতার কারণে তা হারাম হওয়ার স্তর অনেক গুণ বাড়িয়ে দিবে। যেমনিভাবে মদ ও সুদের হারাম হওয়ার বিষয়টি তার পরিপার্শ্বিক বিষয়ের কারণে একটি দৃষ্টান্তমূলক হারাম গুনাহের রূপ পরিগ্রহ করে।

আফসোসের কথা হল, এই লোকেরা ইসলামের স্বার্থ ও মুসলমানদের স্বার্থের মাঝে পার্থক্য করতে পারছে না। আর মুসলমানদের স্বার্থে দরদী হয়ে ইসলামের বড় স্বার্থকে বিলীন করছে। অথচ প্রকৃত অর্থে এই লোকেরা ইসলামের স্বার্থ রক্ষার জিম্মাদার। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জিম্মাদার নয়। অবশ্য তাদের এই সুপ্ত রহস্যও জানতে হবে যে, মুসলমানের আসল স্বার্থ ইসলামের স্বার্থ রক্ষার মাঝেই নিহিত আছে। যদিও প্রথমে বাহ্যিকভাবে তাদের স্বার্থ বিরোধী মনে হোক না কেন।

কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে, জাতির এতটুকু ক্ষতিও হতে দেওয়া যায় না। তাহলেও তার চিন্তা করা উচিত, এই কাজের জন্য জাতির মাঝে লোকের অভাব নেই। সে যেই চেয়ারে বসতে চায়; সে যদি তাতে না বসে, তাহলে ঐ চেয়ারে বসার যোগ্য লোকের অভাব নেই এবং অনেক লোক তার জন্য প্রস্তুত আছে। তাদের উপর কী মসিবত আসলো যে, তারা এই বে-দ্বীনের ঝাণ্ডা নিজ হাতে উঠানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত? তারা কেন এ কাজ অন্যদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেরা জীবনের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আলোর বাতিঘর রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন না? ইসলাম, কুরআন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এতটুকু হক তো আছে যে, সে অন্তত নিজের কাজ দ্বারা এই খবীস শাসনব্যবস্থাকে পুতঃপবিত্রতার সার্টিফিকেট প্রদান করবে না। যে শাসনব্যবস্থা খোদাদ্রোহিতার তুফান সৃষ্টি করছে। এই আলেম লোকেরা তো দুনিয়ায় ইসলামের শেষ আশ্রয়স্থল। এরাই যদি ইসলামের সাথে এমন আচরণ করে, তাহলে ইসলাম কীভাবে বাকি থাকবে?

এই বুযুর্গ ব্যক্তিদের মনে রাখা উচিত- এই রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির পরিধি এখন এমন জায়গায় গিয়ে শেষ হয়, যেখানে মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাপ্তি হয়। এজন্য জাহেলি নেযামের সহযোগিতা ও আমলীভাবে তার আনুগত্য কোন এক স্তর পর্যন্ত আটকে রাখা যায় না। বরং এই সহযোগিতা তার জন্য এক চোরা বালি হিসাবে প্রমাণিত হবে। যার দরুন এতে ফেঁসে গিয়ে দিন দিন তার পা শুধু এর গভীরতায় যেতেই থাকবে। সে শুধু তার দেশে সেক্যুলারিজমের প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করতেই বাধ্য হবে না, বরং দুনিয়ার কোথাও যদি ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালুও হয়, তাহলে সে ভ্রু-কুঞ্চিত করতে বাধ্য হবে। সে মৌখিকভাবে এই আশা ও আকাঙ্খা প্রকাশ করতে বাধ্য হবে যে, "ইনশা আল্লাহ" "ভবিষ্যতে" "সেখানে"ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু হবে। বরং তাকে একথা বলাতেও বাধ্য করতে পারে যে, আমাদের এই শাসনব্যবস্থাও ইসলামী শাসনব্যবস্থা। যদিও সে শাসনব্যবস্থার সংবিধানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং কুরআন ও সুন্নাহর কোন নামগন্ধও নেই। যারা এই শাসনব্যবস্থাকে জাহিলি ও অনৈসলামিক বলবে তারা পাগল ও মূর্খ। এই মৌলিক আপোষের পর জীবন সমস্যার কত সমাধানই না জাহেলি তরিকায় দেওয়া হবে, তারপর তাকে বলা হবে, তুমি চোখ বন্ধ করে একে "ইসলামী" বলে স্বীকৃতি দিয়ে দাও অথবা নূন্যতম চুপ থাকার বিবেচনায়- لا بأس به (এতে কোন সমস্যা নেই) এমন একটি কাল্পনিক ধারণা দিয়ে দাও।

'দুই বিপদের মধ্যে সহজটাকে গ্রহণ করা'র ঢাল

এই আলোচ্য বিষয়ে اهون البليتين তথা দুই বিপদের মধ্যে সহজটাকে গ্রহণ করা'র ফিকহী মূলনীতিকে একটি ঢাল বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বীন ও শরীয়তের কত মৌলিক বিষয়াবলীকে এই ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আলোচ্য বিষয় 'দুই বিপদের মধ্যে সহজটাকে গ্রহণ করা'র মত কোন বিষয় নয়। বরং এটা তো নতুন এক বিপদের উদ্ভাবন। যা বিদ্যমান বিপদ (বিপদসমূহ) থেকেও আরো কয়েকগুণ বেশী নিজেই ধ্বংসাত্মক। ধরুন! মুসলমানরা এখন শুধু বিপদের উপর বিপদে আছে। তাদের তো এখন দুই বিপদের বা দুইয়ের অধিক বিপদের মাঝ থেকে কোন একটা বিপদকে গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, তাদের পছন্দনীয় কাজের সকল রাস্তা-ই তো বন্ধ। তাহলে এখন কি সব থেকে হালকা বিপদ এটাই থেকে গেল যে, সে জাহেলি শাসনব্যবস্থার পতাকাবাহী হবে? ধর্মনিরপেক্ষতার ফেরিওয়ালা হবে? কুরআন সুন্নাহকে মসজিদসমূহে তালাবদ্ধ করে মানুষকে প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে, অতঃপর তার চাহিদা অনুপাতে সবকিছু করতে থাকবে? এটাই যদি ইসলামের মুখপাত্রদের, সত্যের সাক্ষীদের, সৎকাজের পতাকাবাহীদের ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিম্মাদারদের জন্য সবচেয়ে হালকা বিপদ হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় বিপদ আর কি হবে? তা কতই না আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ একটি দ্বীন হবে, যা স্বীয় বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাবাহিক বিরোধিতা করাকেও 'দুই বিপদের মধ্যে সহজটাকে গ্রহণ করা'র কথা বলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তারপর আরো মসিবতের কথা হল, এই বিপদের কথা তখন বলা হচ্ছে, যখন অনেক ভালো রাস্তা আছে। কোন ধর্ম প্রচারক, কোন জাতীয় নেতা, সোশ্যাল পথপ্রদর্শক, কমিউনিস্ট লিডারের মুখ তালাবদ্ধ নেই। কেউ এমন নেই যে, কোন একটি বিপদ

গ্রহণ করতে বাধ্য। বরং প্রত্যেকেই স্বাধীনতার সাথে নিজের কথা প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় রাত-দিন নিমগ্ন আছে। কিন্তু সত্য দ্বীনের একজন পতাকাবাহীই শুধু এমন, যার সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেই সক্ষম নয়। তার ভাগে শুধু বিপদই বিপদ। সে তার মিশন প্রকাশ, বাস্তবায়ন, দাওয়াত ও মেহনত কোনটিই করতে পারে না! এটা অবস্থা সম্পর্কে কী ধরণের ভুল ধারণা?

কোন সচেতন মানুষ এটা কীভাবে মেনে নিবে যে, বর্তমানে মুসলমানরা তাদের জীবনের উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করতেই বাধ্য? নিঃসন্দেহে সঠিক পথে চলার রাস্তা পুরোপুরি খোলা আছে[22]। এটা ভিন্ন কথা যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই নষ্ট হয়ে গেছে। আর আমরা বিভিন্ন বিপদাপদের মাঝে কোনটি কম বিপদ তার তালাশেই লিপ্ত আছি। এই ধরনের চিন্তা-ফিকিরের বিন্যাসের মাঝে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে আমাদের এমন ধারণা খারাপ জন্মায়নি তো যে, আমরা এই দ্বীনের নাম নিলেই আমাদেরকে আমাদের ঘর থেকে অপহরণ করা হবে, আমাদের জন্য জমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে ও আসমান মাথার উপর ভেঙে পড়বে? এমন হলে তো শত আফসোস। কারণ তিনি তো আমাদের সাথে অন্য কিছুর ওয়াদা করেছেন।

আসল কথা হলো: اهون البليتين। তথা দুই বিপদের মধ্যে সহজটাকে গ্রহণ করা'র খুবই ভুল প্রয়োগ হচ্ছে। এই মূলনীতির প্রয়োগ এমন ক্ষেত্রে হয়, যেমন মনে করুন- কিছু মুসলমান একটি নৌকায় আরোহন করল। এমন সময় শত্রু বাহিনী তাদের উপর গোলা বৃষ্টি শুরু করল বা নৌকায় আগুন লাগিয়ে দিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের সামনে শুধু দু'টি রাস্তায় খোলা আছে, হয়তো আপন অবস্থায় নৌকায় বসে থাকবে, আর গোলার আঘাতে বা আগুনের লেলিহান শিখায় জীবন বিসর্জন দিবে অথবা সমুদ্রে ঝাপ দিবে, আর ডুবে মারা যাবে। সেই পরিস্থিতিতে শরীয়তের হুকুম হল এই যে, এই দুই অবস্থার মাঝে যেটা তুলনামূলক কম ক্ষতিকারক ও সহজ মনে হবে, সেটাকেই গ্রহণ করবে।

এখন শাসিত মুসলমানদের অবস্থার সাথে তুলনা করুন! বাস্তবেই কি তারা খোলা দিলে জাহেলি শাসনব্যবস্থার সাহায্য ও ইসলামের স্পষ্ট বিধান ও মূলনীতির বিরোধিতা করতে এতটাই বাধ্য, যেমনটা উল্লিখিত উদাহরণের নৌকায় আরোহী লোকদের মত আগুনে পুড়ে মরা বা সমুদ্রে ডুবে মরার দুটি ধ্বংসাত্মক কাজের মাঝে যেকোনো একটি ধ্বংস গ্রহণ করতে বাধ্য?

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আদর্শের ভুল ব্যবহার

জাহেলি ও অনৈসলামী শাসনব্যবস্থার সাহায্য করার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মিশরের জীবনকে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু আসলে এটা দলীল পেশ করা নয়, বরং নিজের চিন্তা-ফিকির ও কাজের বৈধতার জন্য এটি ব্যবহার করা। আসল ব্যাপার না জানার কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে আলোচ্য মাসআলার সাথে মিলিয়ে দেওয়া। এই ইস্তিমবাত তথা উদঘাটিত তথ্য দিয়ে দলীল দেওয়া তখনই সঠিক হতো, যখন এটা প্রমাণ হতো যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম রাষ্ট্রের পুরো ক্ষমতা পাননি। বরং তাঁর ক্ষমতা ছিল আংশিক। ক্ষমতা গ্রহণের সময় তিনি নবী ছিলেন এবং ঐ সময় মিসরের বাদশা আপাদমস্তক অমুসলিম ছিলেন। কিন্তু এই তিনটি বিষয় প্রমাণিত তো নয়ই। বরং বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই প্রতীয়মান হয়। আমরা সামনে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে তার আগে ইস্তিমবাতের জরুরি একটি মূলনীতি বুঝে নিন।

শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েলের উপর চিন্তা-ফিকির করার মূলনীতি হল- আসল থেকে শাখার দিকে, মানসূস(মূল পাঠ) থেকে মাফহুমের (অন্তর্নিহিত মর্মের) দিকে, বিস্তারিত থেকে সংক্ষিপ্তের দিকে এবং মুহকাম (সঠিক, নিশ্চিত) থেকে মুতাশাবিহের (সন্দেহপূর্ণ) দিকে যায়। কোন বিষয় চিন্তা-ফিকির করার ও ইস্তিমবাত করার ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতরূপে ভুল, মূর্খতা ও অনৈসলামিক তরীকা যে, কোন সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট আয়াত ও হাদিসের দূরবর্তী ইশারা দ্বারা কোন মত বের করা। অথচ এ বিষয়ে স্পষ্ট ও মুহকাম নুসূস(কুরআন ও হাদীসের মূল পাঠ) বিদ্যমান রয়েছে।

---

[22] সঠিক পথে চলার রাস্তা কখনো পুরোপুরি বন্ধ হয় না যে, বিপদাপদের মাঝে যে কোন একটি বিপদকে গ্রহন করার গোলক ধাঁধায় পড়ে যাবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: " এই দ্বীন(ইসলাম) সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল কেয়ামত কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত এই দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য লড়াই করতে থাকবে।" (কিতাবুল জিহাদ, সহীহ মুসলিম ও মিশকাত)

আপনি যদি উম্মাহর বিভক্তির ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, বিভক্তির এই ধ্বংসাত্মতা সাধারণত: এই ধরণের ভুল ও বিকৃত চিন্তা-ফিকিরের ইস্তিমবাতের-ই ফলাফল। আল্লাহর কিতাব নিজের ব্যাপারে- تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (তাতে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে) বলে ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু অ-সমতল মেধা তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। আর স্পষ্ট মুহকাম নুসূস বিদ্যমান থাকাবস্থায় অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আয়াত এবং হাদিসের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং দ্বীনের নামে নতুন নতুন মতাদর্শ আবিষ্কার করছে। এমনিভাবে তারা যখন কুরআন ও হাদীসের কতক অস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোন মতামত ইস্তিমবাত করে ফেলল, তখন তারা চক্কর দিয়ে ঐ সমস্ত নুসূসের দিকে মনোযোগ ফিরায়, যা সংশ্লিষ্ট মাসআলার ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও এই মাসআলার গতি প্রকৃতি নির্ধারণে সে সমস্ত নুসূসই প্রকৃত হকদার। তো এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর তাদের উচিত ছিল, এই সুস্পষ্ট নুসূসের আলোকে নিজেদের উদঘাটিত ভুল উস্তিবাতকে সংশোধন করে নেওয়া। কিন্তু তারা তা না করে উল্টো ঐ সমস্ত নুসূসের সাথে গড়িমসি ও বিভিন্ন তাবীলের মাধ্যমে নিজেদের ধারণাপ্রসূত মত প্রমাণে লিপ্ত হয়েছে। যদিও এটা খুব আফসোসের কথা। কিন্তু এটাকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। এই সমস্ত আক্ষেপমূলক প্রেক্ষাপট এই বক্র চিন্তার ফলাফল যে, মানুষেরা দ্বীনের মুহকাম বিষয়াবলীকে পিছনে ফেলেছে এবং অস্পষ্ট ও ইশারা-ইঙ্গিতমূলক নুসূসকে সামনে রেখে দিয়েছে। অতঃপর নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন মতাদর্শ ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলী আবিষ্কার করে এবং সকল মানুষকে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। অথচ এর বিপরীত দিক গ্রহন করাই নিরাপদ ছিল।

এই মূলনীতিকে সামনে রেখে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের “মিসরে চাকরি” করার ব্যাপারটিতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন!

(আলিফ) কুফর ও জাহিলিয়্যাতের সাহায্য এবং বন্ধুত্বের ব্যাপারে অকাট্য, মুহকাম ও স্পষ্ট স্পষ্ট নুসূস বিদ্যমান রয়েছে। উদাহারণস্বরূপ দেখুন-

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾

“পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।”(সূরা মায়িদা: ২)

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ﴿الحج: ٤١﴾

“ আর সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।” (সূরা হাজ্জ: ৪১)

وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ(اى بالطَّاغُوتِ) ﴿النساء: ٦٠﴾

“ আর তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে(তাগুতকে) মান্য না করে।” (সূরা নিসা: ৬০)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴿الأنعام: ٥٧﴾

“আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না।” (সূরা আন‘আম: ৫৭)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة: ٤٤﴾

“যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।” (সূরা মায়িদা: ৪৪)

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴿الأعراف: ٣﴾

“তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না।” (সূরা আ'রাফ: ৩)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴿التوبة: ٣٣﴾

“তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন।” (সূরা তাওবা: ৩৩)

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴿المائدة: ٥١﴾

“তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না।” (সূরা মায়িদা: ৫১)

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾المائدة: ٥٥﴿

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ।" (সূরা মায়িদা: ৫৫)

প্রভৃতি আয়াতসমূহ।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذلكَ أضْعَفُ الإيمَانِ "

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- "তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগ করে) তা পরিবর্তন (বাধা প্রদান) করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।" (সহীহ মুসলিম)

« لاَ تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ ».

"তোমরা মুশরিকদের আলো দ্বারা আলোকিত হইও না (অর্থাৎ তাদের সাথে পরামর্শ করিও না।)" (মুসনাদে আহমাদ)

« أَنَا بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ».

"আমি ঐ সকল মুসলমানের কোন দায়িত্ব রাখি না, যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করে।" (আবু দাউদ)

প্রভৃতি হাদীসসমূহ।

(বা) সব নবীগণকে দুনিয়াতে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মানুষদেরকে[23] এক ইলাহের বন্দেগীর (ইবাদত ও আনুগত্যের) দিকে আহ্বান করা।

উদাহারণস্বরূপ দেখুন-

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾النحل: ٣٦﴿

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।" (সূরা নাহল: ৩৬)

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾الشورى: ١٣﴿

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর।"

(সূরা শূরা: ১৩)

প্রভৃতি আয়াতসমূহ।

(জ্বীম) অকাট্যভাবেই সকল নবীদের পজিশন/অবস্থান এই ছিল যে, তারা মানুষের সর্বোচ্চ মান্যবর ছিলেন। এমন নয় যে, তারা নিজেরাই অন্যের, এমনকি কোন বৈশ্বিক কাফের নেতার অনুসারী, অনুগত ও চাকর ছিলেন।

উদাহারণস্বরূপ দেখুন-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾النساء: ٦٤﴿

"বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।" (সূরা নিসা: ৬৪)

---

[23] মুনকারের সংজ্ঞা ও তার সীমার প্রশস্ততাকে সামনে রাখুন! যার আলোচনা শুরুতে করা হয়েছে।

এই মৌলিক কথাগুলো স্মরণ রাখুন! তারপর কুরআনুল কারীমে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মিশর জীবনের ইতিহাস সম্বলিত আয়াতের শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করুন! তিনি বলেছেন,

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴿يوسف: ٥٥﴾

"আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন।" (সূরা ইউসুফ: ৫৫)

এখানে তিনি দাবী করেছেন; আবেদন করেননি।

তারপর চিন্তা করুন! এর দ্বারা নেযামে কুফরের সাহায্যের বৈধতার প্রমাণ কীভাবে হয়? একদিকে এত পরিমাণ মুহকাম নুসূস ও স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। আরেকদিকে এই সংক্ষিপ্ত আয়াত। যাতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের বাদশাহকে বলেছেন, 'আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন।" এতটুকু ছাড়া কুরআন তো স্পষ্ট করে বলেনি যে, সে সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থা কেমন ছিল? তখন কি তিনি নবী হয়েছিলেন, নাকি হননি? এমনিভাবে কুরআনে এটারও প্রকৃত বাস্তবতা স্পষ্ট করেনি যে, এই দাবি উত্থাপনের সময় মিশরের বাদশার অবস্থা কেমন ছিল? তখন কি তার সামনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল, নাকি হয়নি? যদি তার সামনে তাওহীদ পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে সে কী জবাব দিয়েছিল? সে মুসলমান হয়েছিল, নাকি কাফেরই রয়ে গিয়েছিল?

এখন এই সংক্ষিপ্ত কথার তো ব্যাখ্যা অবশ্যই লাগবে। এছাড়া কোনভাবেই সাহায্য করার ব্যাপার প্রমাণ করা যাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? এমনভাবে যে, এর দ্বারা উল্লিখিত মুহকাম আয়াত ও নুসূসের বিরোধিতা করতে হয়? নাকি এমন ব্যাখ্যা, যার দ্বারা নুসূসের সমর্থন হয়? যদি কেহ দ্বীনের মূলনীতি ও কুরআনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাহলে তার জন্য এর সকল রাস্তা খোলা আছে। সে যা মনে চায় করতে পারে। একজন নবীর ব্যাপারে যা মনে চায় কল্পনা করতে পারে। সে বলতে পারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এক কাফের বাদশার কাছে চাকরির দরখাস্ত করেছেন। সে 'খাজাইনুল আরদ' এর অর্থ সরকারের কোষাগার করতে পারে। সে বলতে পারে এই ক্ষমতা বা চাকরি গ্রহন করার সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হয়েছিলেন, আর বাদশাহ তখনও কাফের ও মুশরিক অবস্থায় ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি চাকরির দরখাস্ত করেছেন। আর সেই কাফের বাদশা তার দরখাস্ত কবুল করেছেন। আর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হওয়া সত্ত্বেও এক কাফের বাদশার অনুগত হয়ে চাকরি করেছেন....!

কিন্তু যে ব্যক্তি এত দুঃসাহসী নয়, সে এ ধরণের চিন্তাও করতে পারবে না। সে যদি চিন্তা করেও তাহলে তার সামনে ঐ সকল মুহকাম আয়াত এসে উপস্থিত হবে, যা ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সে প্রশ্ন করবে- যেখানে বলা হয়েছে সমস্ত নবীকে নিঃশর্ত অনুসরণীয় বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেখানে তাকে এক কাফেরের অনুগত করে দেখানোর সাহস কীভাবে হয়? সমস্ত নবী তো আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন, সেখানে তোমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কীভাবে ফেরাউনের দ্বীনের একজন পৃষ্ঠপোষক ও সংরক্ষক হিসেবে পেশ করছ? প্রত্যেক নবী-রাসূল তো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী ও তাগুতদের বিরোধিতা করার জন্য নির্দেশিত ছিলেন। তাহলে তারা এটা কিভাবে মেনে নিল যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিম সালাম ফিরআউনের মত তাগুতের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন?

স্পষ্টত: এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কখনও সহজ নয়। এজন্য অন্যভাবে চিন্তা করাই হবে নিরাপদ। তা হল, এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, যাতে ঐ সমস্ত মুহকাম আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করতে না হয় এবং এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যা তাবীলের মূলনীতি অনুযায়ী হয়। যার পরিচয় আপনারা সবেমাত্র পেয়েছেন। এভাবে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে ঘটনার বাস্তবতা ভিন্ন দেখা যাবে। ভিন্ন ব্যাখ্যা সামনে আসবে। এর আলোকে বলা যায় ব্যাখ্যা বা ঘটনার চিত্র এমন হওয়া উচিত যে,

(১) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চাকরির দরখাস্ত করেন নি বরং এই পদের দাবী করেছেন।

(২) তিনি আংশিক ক্ষমতা চান নি বরং পূর্ণ চেয়েছেন।

(৩) এমনও হতে পারে তিনি তখন নবী হননি।

(৪) এটাও তো অসম্ভব নয় যে, তাঁর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ফিরাআউন ইসলাম গ্রহন করে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘটনার প্রকৃত চিত্রায়ন এমনভাবে হওয়া উচিত যে, কুরআনে নবুওয়তের যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন, তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঘটনার চিত্র এমনই ছিল।

দলীল-প্রমাণের আলোকে ঘটনার সঠিক চিত্রায়ন

কিন্তু আমি চাই না যে, আপনারা শুধু মূলনীতির উপর লক্ষ্য করে এই চিত্রায়নকে মেনে নেন। এজন্য আরও মানসিক প্রশান্তির জন্য এটাও জেনে রাখুন, কুরআনের স্পষ্ট ইশারা এবং তাওরাতের কিছু স্পষ্ট বক্তব্য ও কিছু ইঙ্গিত দ্বারা ঘটনার এমন চিত্রই ফুটে উঠে, যেমনটা হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহর কিতাবের বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোন ধরণের বৈপরীত্য নেই। এটা হতে পারে যে, কোন একটি ব্যাপারে কুরআনে কিছুই বলা হয়নি। তার প্রতি কোন ইশারাও দেওয়া হয়নি। কিন্তু এটা হতে পারে না যে, কোন বিষয় বলেছে অথবা এর মধ্যে কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে, আবার অপর জায়গায় তার বিপরীত কথা বলেছে। যখন কুরআন নবুওয়াতের একটি বিশেষ মাপকাঠি দাঁড় করিয়েছে, তখন এটা সম্ভব নয় যে, কোন নবীর অবস্থার ব্যাপারে এই মাপকাঠির বিপরীত কোন কথা থাকবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও একজন নবী ছিলেন। এজন্য তার ক্ষেত্রেও এই মূলনীতিকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং যে বিষয়গুলো থাকাকে আমরা মূলনীতির চাহিদা বলে দাবী করেছি, তা কুরআন ও তাওরাত এবং তার হাশিয়া দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো এই:

১. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চাকরির আবেদন করেন নি, বরং তিনি ঐ পদের দাবী করেছেন। এর প্রমাণ কুরআনের এই আয়াতের শব্দাবলীর দ্বারা পাওয়া যায়:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿يوسف: ٥٤﴾

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿يوسف: ٥٥﴾

"বাদশাহ বললঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বললঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ইউসুফ বললঃ আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।" (সূরা ইউসূফ: ৫৪-৫৫)

স্পষ্ট কথা হল: হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ 'আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন' তখনই বলেছেন, যখন মিসরের বাদশাহ পূর্ব থেকেই তাঁকে নিজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, নির্ভরযোগ্য এবং নিজের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানী ও প্রভাবশালী বলে বিবেচিত করে তাঁর সামনে সরাসরি ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে স্পষ্ট যে, مَكِينٌ أَمِينٌ 'বিশ্বস্ত সহচর' বলার দ্বারা এর দ্বারা কখনো এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাঁকে নিজের রাজ-দরবারের একজন "রত্ন" বানিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। বরং এই কথার স্পষ্ট দাবী হলো, সে তাঁকে নিজের রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত লোক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারপর তিনি যখন জবাবে বললেন যে, اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ। 'আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন', তো এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, তিনি চাকরির আবেদন করেছেন? এটা তো এক স্পষ্ট দাবী ছিল। যা তাঁর ঈমানী বিচক্ষণতার এক অসাধারণ প্রমাণ। নতুবা বিংশ শতকের কোন খান-বাহাদুর যদি সেখানে হতো, তাহলে জেল থেকে আসার পর পরেই তাকে এত বড় রাষ্ট্রীয় চাকরি দেওয়ার কথা শুনেই তো বাদশার সামনে সেজদায় পড়ে যেত। আর যদি কোন কমরেড হতো, তাহলে সেও তার সামনে সম্মান ও কৃতজ্ঞতার দরুন অবশ্যই চুপ করে বসে থাকত, আর অপেক্ষায় থাকত যে, এখন দেখি এই مَكِينٌ أَمِينٌ 'বিশ্বস্ত সহচর' হওয়ার আমলী নুমনা কি হয়। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি তার ঈমানী বিচক্ষণতা দ্বারা, যার সাথে নবুওয়াতের আলোকরশ্মির বিকিরণ তো ছিলই, যার দরুন তিনি সাথে সাথে এই পদের স্পর্শকাতরতা বুঝে গেলেন এবং তিনি তার কৃতজ্ঞতা আদায় ও ইহসানের প্রতি লক্ষ্য না করে তার সামনে এক দাবি উত্থাপন করে বললেন যে, اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ। 'আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন।' তাহলে আমি এই ক্ষমতাকে গ্রহণ করব। নতুবা আমি আপনার শাসনের রথ টানার জন্য কখনোই প্রস্তুত নই। কারণ, সত্যিকারের বান্দারা এই কাজের জন্য দুনিয়াতে আসেন-ই না।

২. তাঁর দাবী আংশিক ক্ষমতার ছিল না, অর্থাৎ শুধু ধন-ভান্ডারের মন্ত্রণালয়ের দাবি ছিল না। বরং কার্যত পুরোপুরি স্বাধীনতার সাথে কাজ করার দাবী ছিল। এতটুকু স্বাধীনতা, যতটুকু দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাজসমূহ স্বাধীনভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়।

মালিক (বাদশা) এবং ফেরাউন হওয়ার এই শাব্দিক সম্বোধন, কতিপয় মোতি-মাণিক্যের প্রকাশ; যাকে তাজ(মুকুট) বলা হয় এবং সাদা-কালো কিছু কাঠের সমষ্টি; যাকে সিংহাসন বলা হয়, এই সমস্ত জিনিস সাধারণ মানুষের কাছে কতই না গুরুত্ব এবং মর্যাদার বিষয় বলে পরিগণিত হোক না কেন, কিন্তু কার্যত রাষ্ট্র পরিচালনায় এটা কোন গুরুত্ব-ই রাখে না। সুতরাং এই সমস্ত জিনিস মিসরের ফিরউনের নিকট রেখেই তথা বাদশাকে বাদশা নামে রেখেই বাকি সকল রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দাবি করেছেন যে, এ সবকিছু আমার হাওয়ালা করে দিন। এই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতায়নের দিকে কুরআনে সুস্পষ্ট ইশারা আছে, আর তাওরাতে স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

কুরআনের বর্ণনা

তিনি[24] পুরো 'খাজায়েনে আরদ' এর দায়িত্ব চেয়েছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পুরো হুকুমত। 'খাজায়েন' শব্দটি কুরআনের পরিভাষায় শস্যের স্তুপ ও ধন-দৌলতের ভান্ডার-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যেমনটা ধারণা করা হয়। এর জন্য কুরআনের পরিভাষায় 'কানয' 'মাল' 'ছামারাত' ইত্যাদি শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়।

তাঁর হাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও ছিল। তাঁর ভাই বিনইয়ামীন আল্লাহর কুদরতের বিশেষ হিকমতের বদৌলতে তাঁর কাছে এসে পড়ল। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴿يوسف: ٧٦﴾

"ইউসূফের জন্য এটা সঠিক ছিল না যে, সে তাঁর ভাইকে শাহী আইনের মাধ্যমে আটকে রাখবে।" (সূরা ইউসূফ: ৭৬)

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণও তাঁর হাতে ছিল। বরং এটাও বলা যায় যে, রাষ্ট্রের বিচার বিভাগও তাঁর নামেই ছিল, যার দরুন তিনি নিজেই আদালতের বিচারক ছিলেন। তিনি যদি শুধু খাদ্য-শস্যের বা ধন-ভান্ডারের দায়িত্বে থাকতেন, তাহলে মুকাদ্দমা তাঁর সামনে পেশ করা হতো না। এমনিভাবে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে বিনইয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদনও করত না।

কার্যত সিংহাসনে তিনিই বসতেন। এ কারণেই যখন তাঁর পিতামাতা কিনান থেকে মিশরে পৌঁছালেন:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴿يوسف: ١٠٠﴾

"এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন।" (সূরা ইউসূফ: ১০০)

তারপর তাদের সামনে নিজের রাষ্ট্র ক্ষমতার শুকরিয়া আদায় ও আল্লাহর স্তুতি বন্দনা গাইতে গিয়ে বলেন:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴿يوسف: ١٠١﴾

'হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন।" (সূরা ইউসূফ: ১০১)

মনে রাখতে হবে যে, তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন মিসরের ফিরআউন জীবিত ছিল। (পয়দায়েশ, বাব ৪৭)

এই জাতীয় কথাবার্তা বলা অথবা এমন কর্মকান্ড করা কি কোন খাদ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর পক্ষ হতে প্রকাশ পেতে পারে, নাকি পুরো ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারীর পক্ষেই কেবল সম্ভব?

তাওরাতের বর্ণনা

ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাথে প্রথমবার মুলাকাত/সাক্ষাৎ করার ও তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পরেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর বিচক্ষণতার প্রেমিক হয়ে যায় এবং ঐ সময়ই সে তার সভাসদদের সম্বোধন করে বলল:

---

[24] খাজায়েন-এর কুরআনী পরিভাষার উদ্দেশ্য উলামায়ে আদব ও কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, خزائن الله اى مقدوراته অর্থাৎ خزائن الله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতের সমস্ত জিনিস ও কথামালা।(মুফরাদাত, ইমাম রাগেব ইস্পাহানী)

"'আমরা কি এই লোকের মত, যার মাঝে আল্লাহর রূহ রয়েছে, এমন কাউকে আর পাব?' তারপর ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, 'আল্লাহ যেহেতু আপনাকে এ সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাই আপনার মত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি আমার ঘরে অবাধে বিচরণ করতে পারবেন এবং আমার সব জনগণ আপনার হুকুমের অধীনে চলবে। আমি শুধু সিংহাসনের মালিক হওয়ার কারণে বেশি সম্মানিত হব।' তারপর ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, 'দেখুন! আমি আপনাকে পুরো মিসরের শাসক নির্ধারণ করছি। তারপর ফিরআউন তার হাতের আংটি খুলে তাকে পরিয়ে দিল এবং তাকে একটি পাতলা কাতানের পোশাক পরিয়ে সুসজ্জিত করে গলায় একটি স্বর্ণের হার পরিয়ে দিল। তারপর তাঁকে তার অন্য একটি ঘোড়ার গাড়িতে আরোহন করিয়ে তাঁর সামনে একজন ঘোষক সারা শহরে জনগণের সামনে এই ঘোষণা করতে লাগল যে, প্রিয় দেশবাসী! বাদশাহ তাঁকে পুরো মিসরের শাসক হিসাবে মনোনীত করেছেন।' তারপর ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, 'আমি মিসরের ফিরআউন তথা বাদশা, কিন্তু আপনার হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি পুরো মিসরে নিজেদের হাত পা নাড়াতে পারবে না।'

আর ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর নাম "জাঁহাপনা" রেখেছে।" (কিতাব পয়দায়েশ: ৩৫-৩৮)

দিনের আলোর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট এই বক্তব্যকে পড়ুন! আর ঐ সমস্ত লোকদের সুন্দর চিন্তা-ভাবনাকে বাহবা দেন, যারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে শুধুমাত্র ফিরআউনের ধন-ভান্ডারেরে একজন অফিসার মনে করে থাকেন এবং যারা এটা মেনে নিতে অপছন্দ করেন যে, তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী বানানো হয়েছিল।

৩. প্রবল ধারণা এই যে, যখন মিসরের বাদশা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এই সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন, তখন তিনি নবী হননি। তার আলামতসমূহ নিম্নরূপ:

(আলিফ) তাওরাতের বর্ণনা হল এই যে, ঐ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বয়স মাত্র ত্রিশ বছর ছিল।(পয়দায়েশ: ৪৬) যদিও কুরআনে তাঁর বয়সের ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু কুরআনের ইশারা দ্বারা তাওরাতের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন তিনি মিশরে বিক্রি হয়েছেন, তখনও তাঁর যৌবনকাল শুরু হয়নি। বরং তাঁর যৌবনকাল ঐ সময় শুরু হয়েছে, যখন আযীযে মিসরের কাছে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন। وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ (যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল) অতঃপর খুব দ্রুতই তাকে জেলে যেতে হয়েছে এবং কয়েক বছর জেলের বন্দী জীবন অতিবাহিত করার পর মুক্তি পেয়েছেন। কুরআনের এই বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, তখন তাঁর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ বছর ছিল। এজন্য তাওরাতের বর্ণনা সঠিক মনে না করার কোন কারণ নেই। এবার আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন যে, এটা বুঝ ও জ্ঞান পরিপূর্ণ হওয়ার বয়স কিনা? আর সাধারণত: নবুওয়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার রীতি অনুযায়ী কত বছর বয়সকে নির্বাচন করা হয়? যতটুক পর্যন্ত ধারণা কাজ করে, তার আলোকে বলা যায় যে, চল্লিশ বছর বয়সেই সাধারণত: হযরাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদেরকে রিসালাতের ভার বহন করার জন্য মনোনীত করা হয়। তাই যদি এই ধারণা করা হয় যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাবস্থায় নবী ছিলেন না, তাহলে তা একেবারে অমূলক কোন ধারণা হবে না। আর তখন তিনি যে তাওহীদের দাওয়াতের কাজ করেছেন, তা ছিল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উম্মাতের একজন সদস্য হিসেবে। তাওহীদের এই গুরু রহস্য তিনি তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে থেকেই শিখে এসেছিলেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে তা আরো উন্নত ও পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল।

(বা) তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নেওয়ার আট-নয় বছর পর তাঁর ভাইয়েরা শস্য নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল এবং এক উদ্ভুত পরিস্থিতির এক পর্যায়ে তারা তাঁকে এভাবে সম্বোধন করেছিল:

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ﴿يوسف: ٧٨﴾

"হে আযীয, তার(এই ছেলের) পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক।" (সূরা ইউসূফ: ৭৮)

নবুওয়তের মর্যাদা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য এমন নয় যে, তা থাকতে অন্য কোন মর্যাদার শব্দ দ্বারা ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হবে। যদি তিনি তখন নবী হতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর ভাইয়েরা তাকে নবী বলে সম্বোধন করত। শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয় যে, নবী বলে সম্বোধন আযীয বলে সম্বোধনের তুলনায় বেশী সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, বরং এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, এটা ঐ সময়ের দাবী ছিল। তারা তাদের ভাই বিনইয়ামীনকে ছাড়িয়ে নিতে কাতর মিনতির সাথে রহমের দরখাস্ত করছিলেন এবং তারা

এই সূক্ষ্ম বিষয় খুব ভালভাবেই জানতেন যে, 'নবী' ইউসূফ বিদ্যমান থাকাবস্থায় 'আযীযে' ইউসূফের কাছে রহমের দরখাস্ত করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'আযীয' তো ক্ষমতা ও প্রতাপের চেহারার নাম, যা খুব কম সময়েই নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। অন্যদিকে নবুওয়াত তো পুরোপুরি রহম ও দয়ার আধার, যে জানে না যে, কিভাবে প্রার্থীকে খালি হাতে বিদায় করতে হয়।

৪. মিশরের ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহন করে ধন্য হয়েছিলেন।

তার আলামতসমূহ ও দলীল-প্রমাণাদি নিম্নরূপ:

(আলিফ) তাওরাতের বর্ণনা তো কেবলই উল্লেখ করে আসলাম। তার শব্দাবলীর উপর আবারো একবার দৃষ্টি বুলান:

'আমরা কি এই লোকের মত, যার মাঝে আল্লাহর রূহ রয়েছে, এমন কাউকে আর পাব?'

ফিরআউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, 'আল্লাহ যেহেতু আপনাকে এ সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন..."

খেয়াল করুন! এই জাতীয় শব্দাবলীর উচ্চারণ কি কোন কাফিরের, কোন মুশরিকের অথবা কোন আল্লাহদ্রোহীর হতে পারে? ফিরআউন "আল্লাহর রূহ" এবং "আল্লাহ যেহেতু বুঝিয়ে দিয়েছেন" ইত্যাদি শব্দাবলী এমনভাবে উচ্চারণ করতেছেন যে, যেন তিনি তাওহীদের নিগূঢ় রহস্য জানেন ও আল্লাহ তা'আলাকে চিনেন।

(বা) যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কথা হবে যে, ফিরআউন কুফর ও শিরকের প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও এমন এক ব্যক্তিকে নিজের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেছে, যিনি জেলখানার লৌহদন্ডের ভিতরে থাকাবস্থায়ই কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারী ছিলেন। আর বাহিরে আসার পর না জানি আরো কত কী হয়েছিলেন! পুরো ইতিহাস মন্থন করলেও একথার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যাবে না যে, স্বভাবগত দু'টি বিপরীত জিনিস এভাবে একত্র হয়েছে। এটা তো অকাট্য বিষয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ফিরআউনের সামনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন, আর এটা প্রবল ধারণার চেয়ে বেশী সম্ভাবনাময় যে, 'আল্লাহর রূহ ধারণকারী' এই পবিত্র মানুষের দাওয়াত তিনি গ্রহন করেছিলেন।

নতুবা এক কাফের, এক মুশরিক, এক "ফিরআউন" (তার প্রসিদ্ধ অর্থে) কাফির, মুশরিক ও 'ফিরআউন' থাকাবস্থায়ও একজন নিরব মু'মিন এবং এক তাওহীদবাদী-ই নয়, বরং ঈমান ও তাওহীদের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বানকারী একজন বড় দাঈর প্রতি কীভাবে এত রাজি-খুশি হতে পারেন যে, নিজের সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিলেন? নিঃসন্দেহে এটা তখনই হতে পারে, যখন এই কুফর ও ঈমান উভয়-ই আপন আপন অবস্থান থেকে কিছু কিছু ছাড় দিবে। নতুবা তাদের একটিও যদি নিজ নিজ আদর্শে অটল থাকে, তাহলে এই ঐক্য এবং অনৈক্য সম্ভব নয়। বিশ শতকের ঈমান কুফর তো এতটুকু "উদার ও সহিষ্ণু" অবশ্যই। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব বিশ শতকে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল-ই বটে। মানলাম কুফর কিছু ছাড় দিতে পারে, কিন্তু ঈমান (আর ঈমানও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঈমান)-এর ব্যাপারে এই ধরণের খারাপ ধারণা অন্তর মেনে নেয় কীভাবে?

সুতরাং উলামায়ে কেরামের এমন কতিপয় লোক বিদ্যমান আছেন, যারা ফিরআউনের ব্যাপারে এই মত পোষণ করেছেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুজাহিদ রহ. বলেন, 'মিশরের বাদশা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।' (ইবনে জারীর, কাশশাফ)

এই বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে সামনে রাখুন! তারপর ভেবে দেখুন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইতিহাস সঠিকভাবে কী প্রমাণিত হয়। এই সমস্ত বাস্তবতা ও আলামত থাকা সত্ত্বেও কি এমন বক্তব্যের উপর অটল থাকা ঠিক, যাতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মর্যাদা কমে? অথচ এর স্বপক্ষে কোন দলীল বা আলামত নেই। শুধু এতটুকু যে, খাজায়েন এর অর্থ আমরা ধন-দৌলত পড়েছি। আর ফিরআউনের অনাদি ও চিরন্তন অর্থ কাফের জেনেছি, যে কখনও মুসলমান হতেই পারে না। আর কুরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নবী বলা হয়েছে, তাই তাঁর সম্পর্কে যত কথাই বলা হবে, তা আবশ্যিকভাবে তাঁর নবী হওয়ার পরেই হয়েছে বলে ধরা হবে। এটা ভিন্ন কথা যে, এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না যে, এই ধরণের মর্যাদাহানীর কথা জেনে বা না জেনে নবীদের ব্যাপারে বলা ঈমান পরিপন্থী কাজ।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ!

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين

****